HUMAN RIGHTS WATCH

”আমার পাওনা ..... মৃত্যুর আগে কি পাবো ?”

বিবাহ, পৃথক বসবাস এবং তালাক বিষয়ে বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক আইন: নারীর বঞ্চনা ও ক্ষতির উপাখ্যান

HUMAN RIGHTS WATCH

“আমার পাওনা ..... মৃত্যুর আগে কি পাবো ?”

বিবাহ, পৃথক বসবাস এবং তালাক বিষয়ে বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক আইন: নারীর বঞ্চনা ও ক্ষতির উপাখ্যান

কপিরাইট © ২০১২ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
সকল অধিকার সংরক্ষিত
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রিত
ISBN: 1-56432-941-0
প্রচ্ছদ: রাফায়েল জিমেনেজ

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিশ্বব্যাপী জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় নিবেদিত একটি সংস্থা। আমরা বৈষম্য নিরোধ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা, যুদ্ধকালীন সময়ে অমানবিক আচরণের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা এবং অপরাধীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসার জন্য নিপীড়িত মানুষ এবং অধিকার কর্মীদের পাশে দাঁড়াই। আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদঘাটন করি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি দাঁড় করাই। সরকার এবং অন্যান্য ক্ষমতাধররা যাতে ক্ষমতার নিপীড়নমূলক চর্চার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন সেজন্য তাদেরকে আমরা চ্যালেঞ্জ করি। 'সবার জন্য মানবাধিকার' এই নীতিকে সহায়তার জন্য আমরা বিভিন্ন সরকারি সহযোগী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তালিকাভুক্ত করে থাকি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ হলো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যার কর্মকর্তা/কর্মীরা বিশ্বের ৪০টিরও অধিক দেশে দায়িত্ব পালন করছেন। বিশ্বের যেসব শহরে সংস্থাটির অফিস রয়েছে সেগুলো হলো আমস্টারডাম, বৈরুত, বার্লিন, ব্রাসেলস্, শিকাগো, জেনেভা, গোমা, জোহানেসবার্গ, লন্ডন, লস এঞ্জেলস্, মস্কো, নাইরোবি, নিউইয়র্ক, প্যারিস, সানফ্রান্সিসকো, টোকিও, টরোন্টো, টিউনিস, ওয়াশিংটন ডিসি, এবং জুরিখ।

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: http://www.hrw.org

সেপ্টেম্বর ২০১২

1-56432-941-0

"আমার পাওনা ..... মৃত্যুর আগে কি পাবো ?"

বিবাহ, পৃথক বসবাস এবং তালাক বিষয়ে বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক আইন: নারীর বঞ্চনা ও ক্ষতির উপাখ্যান

পাদটীকা ১

সার-সংক্ষেপ ২

বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন ৬
মুসলমান ৭
হিন্দু ৮
খ্রিস্টান ৯
নারী এবং তাদের পোষ্যদের উপর পারিবারিক আইনের প্রভাব ৯
আদালতে লড়াই ১০
সামাজিক সহায়তা ১২

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ১৫

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ১৮

১. নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান এবং বিয়ের ফলাফল ২০

প্রেক্ষাপট ২০
নারীর অর্থনৈতিক অবস্থার পটভূমি ২০
বিয়ে এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব ২৩
নারীর আয়মূলক কাজ এবং উপার্জন ও সঞ্চয়ের ওপর বিয়ের প্রভাব ২৩
বৈবাহিক বাড়িতে (স্বামীগৃহে) নারীর অবদান ২৬
বৈবাহিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ৩০

২. বিবাহ, তালাক ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন ৩১

পারিবারিক আইন ৩১
মুসলিম পারিবারিক আইন ৩৪
হিন্দু পারিবারিক আইন ৪১
খ্রিস্টান পারিবারিক আইন ৪৩
বিবাহোত্তর সম্পত্তি আইনের অভাব ৪৫
পারিবারিক আইনের সংস্কার ৪৭

৩. বিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত এবং পৃথক বসবাসকারী নারীদের উপর বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইনের প্রভাব ৫১

পারিবারিক নির্যাতন ৫১
অর্থনৈতিক ক্ষতি ৫২
বাসস্থান ৫৪

খাদ্য ৫৫
স্বাস্থ্য ৫৬
শিশুশ্রম ও শিশুদের শিক্ষা ৫৭

৪. আইনী প্রতিবন্ধকতা ৫৮

অনানুষ্ঠানিক সমঝোতা বা সালিশ ৫৯
আদালতে যত লড়াই ৬০
পারিবারিক আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা ৬১
ভরণপোষণ নির্ধারণের অস্পষ্ট মানদ- ৬৩
অবাস্তব এবং বোঝাস্বরূপ আইনী প্রক্রিয়া ৬৭
"আইনগত" হয়রানি ৭৩

৫. তালাকপ্রাপ্ত, পৃথক বসবাসকারী এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা ৭৬

নারীদের জন্য সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র ৭৬
ভবঘুরেদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র ৭৭
সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি ৭৯
ভূমি বন্টন কর্মসূচি ৮২

৬. আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা ৮৩

বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের সময় প্রযোজ্য সমানাধিকার ৮৩
সিডও কনভেনশনে বাংলাদেশের সংরক্ষণ ৮৫
বহুবিবাহ ৮৬
তালাকের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের জন্য অসম বিধান ৮৭
বৈবাহিক সম্পত্তির আইনগত স্বীকৃতির অভাব ৮৮
ভরণপোষণ আদায়ের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ ৯০
বিবাহ নিবন্ধন ৯২
স্বীকৃত নয় এমন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান ৯২
সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ৯৩

৭. সুপারিশ ৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের: ৯৫
সংসদ সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি; ৯৫
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতি; ৯৭
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির প্রতি; ৯৭
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি; ৯৯
ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতি; ৯৯
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি; ৯৯
স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতি; ১০০
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রতি; ১০০
আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর প্রতি; ১০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ১০২

পরিশিষ্ট - ১ ..... ১০৪

পরিশিষ্ট - ২ ..... ১০৬

পাদটীকা

যৌতুক	বিবাহ কিংবা বিবাহ পরবর্তী সময়ে কন্যা ও তার পরিবার থেকে বর কিংবা তার পরিবারকে কোন অর্থকড়ি, উপহার বা অন্য কোন ধন-সম্পদ দেওয়ার যে প্রথা প্রচলিত আছে, সেটিই যৌতুক। এই প্রথা আইন-বিরম্নদ্ধ, কিন্তু বহুল প্রচলিত।
কাবিন-নামা, নিকাহ্নামা	মুসলিম আইনে এটি একটি বিবাহ চুক্তিপত্র। এই চুক্তির জন্যে বাংলাদেশ সরকারের একটি নির্ধারিত ফরম্যাট আছে।
দেনমোহর	দেনমোহর হল কিছু পরিমাণ টাকা বা সম্পত্তি যা একজন মুসলিম স্বামী তার স্ত্রীকে বিবাহের বিনিময়ে পরিশোধ বা প্রদান করতে প্রতিশ্রম্নতিবদ্ধ হন। এর অংশবিশেষ কিংবা পুরোটাই চাহিদা মোতাবেক অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় কিংবা মৃত্যুর পর পরিশোধ করা হয়। এটি স্বামী কর্তৃক কিংবা তার পরিবার থেকে পরিশোধ করা হয়, এবং এই দেনমোহর অর্থ কিংবা সম্পত্তি যে কোন রূপেই পরিশোধ করা যেতে পারে।
খোরপোষ	সাধারণত স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান বাবদ যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ বা সাংসারিক খরচপত্রই হলো খোরপোষ।
নারী-প্রধান পরিবার	যে পরিবারে কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরম্নষ থাকে না সেই পরিবার হলো নারী-প্রধান পরিবার। তবে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই শব্দের দ্বারা এমনটি বোঝায় না যে, পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক পুরম্নষ থাকলেই সেসব পরিবারকে পুরম্নষ-প্রধান পরিবার বলা হবে।
কাজী	একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যিনি মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ নিবন্ধন করেন।
খুলা	মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান এক ধরনের বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা, যা পারম্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির বক্তব্য হচ্ছে, এটি সাধারণত নারীদের দ্বারা শুরম্ন হয় এবং তাদের জন্যে (বিবাহ-বিচ্ছেদের) একটি সুযোগ এখানে থাকে, যদি তারা তাদের স্বামীর অনুকূলে কোন বিনিময় মূল্য বা অর্থ প্রদান করেন কিংবা কিছু স্বার্থ (সাধারণত দেনমোহরের দাবী) ত্যাগ করার বিষয়টি বিবেচনা করেন।
তালাক	মুসলিম পারিবারিক আইনে পুরম্নষকে প্রদত্ত একতরফা ক্ষমতা, যা দ্বারা কোন ত্রম্নটি উলেস্নখ না করেই স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। এই আইন বলে স্ত্রী শুধুমাত্র তালাকে তফইজের ক্ষমতা থাকলেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।

সার-সংক্ষেপ

মুসলমান সমাজের নারী শেফালি তার স্বামীকে নিয়ে ভাসুরদের সাথে এক বাড়ীতে বসবাস করতেন। তিনি পরিবারের ক্ষেতে খামারে কাজ করার পাশাপাশি গৃহস্থালির সব কাজও নিখুঁতভাবে সম্পাদন করে থাকেন। প্রথমবারের মতো সন্তান-সম্ভবা হওয়ার পর শেফালি তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন এবং এর জন্য প্রতিবাদ জানান। স্বামী তাকে প্রচ- জোরে লাঠি মারেন এবং শাস্তিস্বরূপ শীতের সারা রাত বিবস্ত্র অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখেন। একদিন কোন এক ঘটনায় স্বামী তাকে সংজ্ঞাহীন না হওয়া পর্যন্ত মারতে থাকেন। একসময় শেফালিকে পরিত্যাগ করে স্বামী দ্বিতীয় আরেকটি বিয়ে করেন। তারপরও শেফালি ভাসুরদের আশ্রয়ে এবং তাদের মারপিট সহ্য করে আগের গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। কারণ তার পিতা-মাতা এতই দরিদ্র যে তাকে আশ্রয় দেওয়ার সামর্থ্য তাদের ছিলনা এবং শেফালি বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও তার নেই।

হিন্দু সমাজের নারী নম্রতা একটি ব্যবসা শুরু করার জন্য তার সারা জীবনের সঞ্চয় স্বামীর হাতে তুলে দেন। স্বামী ঐ টাকা ব্যবসার কাজে না খাটিয়ে অন্যভাবে সেগুলি নয়ছয় করে ফেলে। নম্রতা যখন এর প্রতিবাদ জানান এবং টাকাগুলি ফেরত দিতে বলেন তখন স্বামী তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে নম্রতাকে পানির বদলে এসিড পান করায়। নম্রতা আমাদেরকে জানান, "পানি পান করতে গিয়ে দেখি আমার মুখ এবং ভিতরটা যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে।" এই ঘটনার পর নম্রতার স্বামী পালিয়ে যায়। এদিকে নম্রতার খাদ্যনালী পুড়ে যাওয়ায় কোন কিছু খাওয়ার জন্য তিনি খাদ্য সরবরাহকারী টিউবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নম্রতা তার স্বামীকে তালাক দিতে চান, কিন্তু হিন্দু পারিবারিক আইন তার সেই তালাক অনুমোদন করবেনা।

খ্রিস্টান সমাজের নারী জয়ার প্রতিদিনের গৃহস্থালিকর্ম শুরু হয় ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে। কাজে যদি কোন ছেদ পড়ে এবং তা যদি নিজের ছোট্ট মেয়েটিকে খেলাচ্ছলে ভূলিয়ে রাখার জন্যও হয়, তাহলেও তার শ্বাশুড়ি বেশ রেগে যেতেন। প্রায় সময় তিনি স্নান করার সময়টাও পান না। দুপুরে খাওয়ার পর কখনও ঝিমুনি আসলে শাশুড়ি তার উপর ক্ষুব্ধ হন এবং অপমান করেন। জয়ার স্বামীও মাঝে মাঝে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এবং গালিগালাজ করেন। এসব শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জয়া বেশ কয়েকবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে একটি চার্চে এবং বাবা-মায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। প্রতিবারই চার্চ কর্তৃপক্ষ এবং বাবা-মা তাকে জোরপূর্বক স্বামীর বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। এদিকে স্বামীগৃহে তার উপর নির্যাতন আগের মতোই চলতে থাকে। আর কোথাও যাওয়ার উপায় কিংবা আলাদা বাসস্থানের জন্য টাকা পয়সার সামর্থ্য না থাকায় জয়া তাদের পারিবারিক সূত্রে পাওয়া এক বান্ধবীর বাড়ির বারান্দা ও বাথরুমে থাকার ব্যবস্থা করেন। এদিকে তার স্বামী ও ভাসুরেরা দুর্নাম রটিয়ে দেন যে, তিনি অন্য একজন পুরুষের সাথে পালিয়ে গেছেন।

শেফালি, নম্রতা ও জয়া সকলেই বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইনগুলির অবিচার ও নেতিবাচক অভিঘাতের শিকার হয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই তাদের বৈবাহিক বাড়িতে আর্থিকভাবে কিংবা অন্য উপায়ে অবদান রেখেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের আইন বৈবাহিক বাড়িতে একজন স্ত্রীর যে অবদান তাকে স্বীকৃতি দেয়না এবং বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় বৈবাহিক সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এই আইন ব্যর্থ হয়েছে। শেফালি, নম্রতা ও জয়াদের কেউ সরকারের কোন সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি বা তার সুযোগ গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

বাংলাদেশে বিবাহ, তালাক ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত যেসব আইন রয়েছে সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্যে আলাদাভাবে নির্ধারিত এসব বিধি-বিধানের অধিকাংশ বহুযুগ (কিছু কিছু ক্ষেত্রে শত বছরেরও) আগে লেখা হয়েছিল। এই আইনগুলি বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় পুরুষদেরকে অত্যধিক ক্ষমতা দিয়ে তৈরি হয়েছে। এসব আইনে নারীদের জন্যে ভরণপোষণ ও দেনমোহরের নামে যে সামান্য আর্থিক স্বত্বের স্বীকৃতি রয়েছে (যা নারীকে প্রদানের জন্যে মুসলিম পুরুষ বিবাহ চুক্তিতে প্রতিজ্ঞা করে), সেগুলি প্রায় ক্ষেত্রে পরিমাণে অতি সামান্য হয়ে থাকে এবং সেগুলি আদায় করাও অত্যন্ত কঠিন।

ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশের পারিবারিক আইনগুলি নারীদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে প্রায়শঃ তাদেরকে নিপীড়নমূলক বিবাহের জালে বন্দি করতে অবদান রাখে কিংবা বিবাহ ভেঙে গেলে তাদের অনেককে দারিদ্র্যের সীমাহীন দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে এই আইনগুলি গৃহহীনতা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামী-বিচ্ছিন্ন নারী ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের স্বাস্থ্যহানির সমস্যা তৈরিতে সরাসরি অবদান রাখে।

এই প্রতিবেদনটি ২০১১ সালে নেওয়া ২৫৫ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের পারিবারিক আইনগুলির দুর্বলতার শিকার ১২০ জন নারীসহ আদালতের সাবেক বিচারক, আইনজীবী, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং সরকারি কর্মকর্তা। তাদের মূল্যায়নে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে এবং সেটি হলো, এসকল পারিবারিক আইন বিবাহ, তালাক ও বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং নারীর অর্থনৈতিক অসমতাকে প্রকট করে তোলে।

প্রতিবেদনে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে এবং সহজ পদ্ধতিতে পারিবারিক এবং নারী সমাজের বিভিন্ন বিষয়াদি নিষ্পত্তিতে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হলেও কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে এই আইন প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে পারিবারিক আদালতের কাছ থেকে কোন সুফল লাভের আশায় নারীদেরকে মাসের পর মাস কিংবা বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করতে হয়। এই প্রতিবেদনে আরও উঠে এসেছে যে, বাংলাদেশের সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিগুলিতেও উলেস্নখযোগ্য নানা প্রতিবন্ধকতা ও ঘাটতি রয়েছে। তালাকপ্রাপ্ত কিংবা স্বামী-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যেসব নারী চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে

পড়েন তাদের অনেকের কাছে এসব কর্মসূচি প্রত্যাশিত সুফল পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ অনেক নারী এখনও এ ধরনের সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি সম্পর্কেই অবহিত নন।

বাংলাদেশে ১০ বছরের অধিক বয়সের কিশোরী বা নারীদের মধ্যে ৫৫ শতাংশের বেশি হলো বিবাহিত। এদেশে অনেকের কাছে বিয়ে আর্থিক নিরাপত্তার যোগানদাতা হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এই বিয়ে আবার অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক সঙ্কটের কারণ হয়েও দেখা দিতে পারে। বিয়ের পর সামাজিক চাপে নারীরা চাকুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলে এবং সংসারের দ্বিগুণ কাজের চাপে অর্থকরি কাজে তাদের অংশগ্রহণের ক্ষমতা কমে গেলে কিংবা নিজের আয় ও সঞ্চয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে পরিবারে অর্থসঙ্কট তৈরি হতে পারে। সরকারি হিসেব মতে বাংলাদেশে তালাকপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা প্রায় ৩৩০,০০০। তাছাড়া এদেশের অসংখ্য নারী স্বামী-বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করেন যার প্রকৃত সংখ্যা এখনও অজানা।

বাংলাদেশের জাতিসংঘ কান্ট্রি টীম 'বৈবাহিক অস্থিতিশীলতা'কে নারী-প্রধান পরিবারগুলোতে দারিদ্র্য এবং 'নিরঙ্কুশ ও চরম' দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন উলেস্নখ করেছে যে, তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামী-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উপার্জনকারী পুরুষ সদস্যকে হারিয়ে ফেলার কারণে নারীরা অনেক বেশী দারিদ্র্য প্রবণ হয়ে পড়েন।

বিবাহিত নারীরা তাদের পরিবার, ব্যবসা, ক্ষেত-খামার এবং অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষায় বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছেন। তারা পরিবারের সেবাযত্নসহ মূলতঃ মজুরিবিহীন নানা কাজের মাধ্যমে পরিবারের উন্নতিতে পুরুষের তুলনায় অধিক শ্রম দিয়ে থাকেন। এই প্রতিবেদনের জন্যে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যেসব বিবাহিত নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে তারা বলেছেন, রান্নাবান্না, ঘরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, কাপড় ধোয়া, গবাদিপশুর দেখাশোনা, পানি সংগ্রহসহ গৃহস্থালির প্রায় সব কাজ তাদেরকে এককভাবে সামলাতে হয়। অনেকে বলেছেন, নারীরা বিয়ের সময় কিংবা দাম্পত্য জীবনে নিজেদের গহনা বিক্রি করে কিংবা নিজের উপার্জিত সব অর্থ স্বামীর হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে পরিবারে উলেস্নখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাদের এসব অবদান স্বামীর নামে সম্পত্তি ক্রয়, স্বামীর উচ্চশিক্ষা লাভ, ব্যবসাপাতি প্রতিষ্ঠা কিংবা তার পেশাগত ও ব্যবসার লাইসেন্স বা পারমিট প্রাপ্তিতে ব্যাপকভাবে সহায়ক হয়েছে। প্রায় সব নারীই বলেছেন, তারা তাদের স্বামী কিংবা শ্বশুর বাড়িতে যৌতুক এনে দিয়েছেন।

যে কয়জন নারীর সাক্ষাৎকার আমরা গ্রহণ করেছিলাম তাতে দেখা গেছে যে, তাদের এই সীমাহীন অবদান সত্ত্বেও, নারীরা তাদের আয়-উপার্জন এবং স্বামীর ঘরের সম্পত্তির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ পান না বললেই চলে। প্রতিদানে পরিবারের মধ্যে তারা যেমন কিছু পাচ্ছেন না, তেমনি বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর তাদের প্রদত্ত অর্থনৈতিক অবদান বা মূল্যেরও কোন স্বীকৃতি মিলছেনা।

স্বামী তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর বাসস্থান ও খাদ্যের সংস্থান করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে এমন একজন মুসলিম নারী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন, "কেবল আলস্নাহ্ই জানেন নারীদেরকে

কতটা দুর্ভোগ পোহাতে হয়।" তিনি আরও বলেন, "আলস্নাহ্ আমাদেরকে নারী না বানিয়ে পুরুষ বানাতে পারতেন!"

দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তার পর, বাংলাদেশে একটা পরিবর্তনের গতি দেখা যাচ্ছে। নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে ২০১০ সালে একটি আইন প্রণীত হয়। এতে বলা হয় যে, 'আর্থিক ক্ষতি' ঘটানো এক ধরনের পারিবারিক নির্যাতন এবং এই আইনে বৈবাহিক (স্বামীর) বাড়িতে স্ত্রীর বসবাস একটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়। যারা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তাদের জন্য এই আইনবলে অস্থায়ী ভরণপোষণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিতে আদালতকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাংলাদেশ ল' কমিশন মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিস্টান পারিবারিক আইনের সংস্কারের লক্ষ্যে একটি গবেষণা সমাপ্ত করে। ২০১২ সালের মে মাসে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা হিন্দু বিবাহের ঐচ্ছিক নিবন্ধন সংক্রান্ত একটি বিলে অনুমোদন দেয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ও দেওয়ানী আদালত প্রক্রিয়ার সংস্কার, বিশেষ করে সমন জারি সংক্রান্ত বিষয়টিকে বিবেচনা করছে - যা পারিবারিক আদালতের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। দশকের পর দশক ধরে নারী অধিকার সংগঠনগুলির দ্বারা অব্যাহত চাপ সৃষ্টির ফলে এসব ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই সংগঠনগুলি অব্যাহতভাবে পারিবারিক আইন এবং এদের প্রক্রিয়াগত সংস্কার দাবি করে আসছিল।

তাদের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানিয়ে এই প্রতিবেদন পারিবারিক আইন ও সংশিস্নষ্ট আইনী প্রক্রিয়ার সংস্কার এবং নারীর জন্যে ন্যূনতম যেটুকু রক্ষাকবচ এখনও বহাল আছে তার যথাযথ বাস্তবায়ন দাবি করছে। সেইসাথে তালাকপ্রাপ্ত কিংবা স্বামী-বিচ্ছিন্ন এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্যে পর্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদানেরও দাবি জানাচ্ছে। বিবাহিত জীবনে পুরুষের সাথে সমানাধিকারের ভিত্তিতে পারিবারিক সম্পত্তির হিস্যায় বৈধ অধিকার এবং স্বামী কিংবা সাবেক স্বামীর কাছ থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা পাওয়ার অধিকারসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির সুবিধা প্রাপ্তি নারীর জন্য সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া সরকারের ভূমি বন্টন ব্যবস্থাটিও বৈষম্যহীন হওয়া দরকার, যাতে নারী-প্রধান পরিবারগুলি সুবিধাবঞ্চিত বা গণনার বাইরে না থাকে। বাসস্থান কিংবা আশ্রয় প্রাপ্তির সুযোগসহ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকেও আরও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

এই প্রতিবেদনে উলেস্নখ থাকছে যে, ধর্মীয় নেতাসহ অন্যদের কাছ থেকে সংস্কারের বিরুদ্ধে শক্ত বিরোধিতা রয়েছে। তারা 'ধর্মীয়' ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না। তাদের যুক্তি হলো, ধর্মীয় শিক্ষায় সংস্কারের কোন জায়গা নেই। পরিবার ও ধর্মের সাথে সংশিস্নষ্ট আইনের সংস্কার সবসময় কোন না কোন বিরোধের জন্ম দেবে। কিন্তু এখানে উলেস্নখ্য যে, অন্যান্য রাষ্ট্র যেখানে মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিস্টান জনসংখ্যা রয়েছে, এমনকি বাংলাদেশের মত মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র কিংবা যেখানে পারিবারিক আইনে শারিয়াহ্ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেসব রাষ্ট্রেও নারীদের আরও ব্যাপক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য পারিবারিক আইনের সংস্কার হয়েছে। এসব সংস্কারের মধ্য দিয়ে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে ধর্মীয় শিক্ষা বা

জ্ঞানের বহুমাত্রিক ব্যাখ্যার প্রতিফলন ঘটেছে। এতে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রচলিত পারিবারিক আইনে যাই থাকুক না কেন গণজীবনের সব ক্ষেত্রে বিদ্যমান যে কোন বৈষম্য দূরীকরণে সরকার ও রাষ্ট্রের একটা বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন

সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম অর্থাৎ পারিবারিক আইন ব্যতীত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে প্রবর্তিত বাংলাদেশের অধিকাংশ আইন লিঙ্গ ও ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে বৈষম্যহীনভাবে সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। কিছু আইনী সংস্কারের সাহায্যে, বিশেষ করে পারিবারিক সহিংসতা এবং এসিড সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পারিবারিক বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যেগুলি সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু বিবাহ, বিচ্ছেদ এবং তালাক সংক্রান্ত পারিবারিক আইনগুলি, যাদের বেশ কিছু আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়কালে প্রণীত, মোটামুটিভাবে এখনও আগের মতই রয়ে গেছে।

২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮৯.৭ শতাংশ) মানুষ মুসলমান। দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা হলো ৯.২ শতাংশ, বৌদ্ধ ০.৭ শতাংশ এবং খ্রিস্টান ০.৩ শতাংশ।

বিবাহ, বিচ্ছেদ এবং তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে মুসলমান, হিন্দু এবং খিস্টানদের জন্য পৃথক আইন রয়েছে। এসব আইন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্তসহ বিভিন্ন বিধিবদ্ধ এবং অ-বিধিবদ্ধ (কিন্তু সরকারিভাবে স্বীকৃত) আইনের সংমিশ্রন। তবে এদেশের বৌদ্ধরা হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত।

মূলতঃ পারিবারিক বিষয়ে বাংলাদেশে চারটি দেওয়ানী আইন রয়েছে যেগুলি সকল ধর্মের সদস্যদের বেলায় প্রযোজ্য। সেগুলি হলো - বিশেষ বিবাহ আইন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন, অভিভাবকত্ব এবং প্রতিপাল্য আইন, এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ। নিজের ধর্ম পরিত্যাগকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রেই কেবল বিশেষ বিবাহ আইন প্রযোজ্য হয় এবং সেকারণে এই আইনের প্রয়োগ খুবই সীমিত। 'দেওয়ানি' বিচ্ছেদ আইন শুধুমাত্র খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এবং যেসব দম্পতি দেওয়ানি বিবাহ আইনের আওতায় বিয়ে করেন, তাদের জন্য প্রযোজ্য।

তিনটি পারিবারিক আইনের সব ক'টিই বিবাহ, তালাক, বিচ্ছেদ এবং ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক, যা নীচে আলোচিত হয়েছে। বৈবাহিক সম্পত্তির স্বীকৃতি এবং বিচ্ছেদ বা তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এর সমান অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতেও এসব আইন ব্যর্থ হয়েছে। এই আইনগুলি প্রায় ক্ষেত্রে নারীদের চেয়ে পুরুষদেরকেই বেশি সুবিধা প্রদান করে এবং নারীদেরকে বঞ্চিত করে, যদি কোন সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ত্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমান অংশীদারিত্ব না থাকে। তবে এধরনের অংশীদারিত্ব একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। বিশ্ব ব্যাংকের ২০০৬ সালের এক জরিপে দেখা যায়, জরিপকৃত

নারীদের মধ্যে ১০ শতাংশের কম নারীর ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পত্তির (নিজস্ব অথবা ভাড়া) দলিলে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকার নজির আছে।

মুসলমান

পুরুষদের বহু বিবাহ, তালাকের বৈষম্যমূলক বিধান, নারীদের বেলায় বিবাহকালীন এবং তালাক পরবর্তী ভরণপোষণ প্রাপ্তির সীমিত অধিকার, তালাক প্রদানের ৯০ দিনের বাইরে ভরণপোষণ না দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইন বৈষম্যমূলক।

তবে মুসলিম পারিবারিক আইনের কিছু ইতিবাচক দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা জরুরী। মুসলিম পারিবারিক আইনে বিবাহ একটি চুক্তি হিসেবে স্বীকৃত। একটি আদর্শ বিবাহ চুক্তি বিবাহকালীন সময়ে নারীদের জন্য অধিকতর অর্থনৈতিক সুরক্ষার বিষয়ে দেন দরবার করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচ পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সংগঠনটি যে ৭১ জন মুসলিম নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে বিবাহ চুক্তি/কাবিননামা সম্পর্কে কিংবা চুক্তিতে দরকষাকষি বা অধিকতর সুবিধাজনক শর্ত যুক্ত করার উপায় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল খুব সীমিত।

বিবাহ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত দেনমোহরে স্ত্রীর অধিকার মুসলিম পারিবারিক আইনে স্বীকৃত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে বয়স্ক নারী যারা দীর্ঘসময় আগে বিয়ে করেছেন তাদের ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পত্তিতে নিজেদের অবদানের তুলনায় দেনমোহরের পরিমাণ খুব কম বলে প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দেখেছে যে, যেসব ক্ষেত্রে অল্প বয়স্ক বিবাহিত নারীদের বেলায় অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে দেনমোহর ধার্য করা হয়েছে সেটি অনেক সময় কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী নারীদের অধিকাংশই স্বীকার করেছেন যে, তাদের স্বামীরা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নির্ধারিত দেনমোহর প্রদানের শর্তের বরখেলাপ করেছে।

বহুবিবাহ বৈষম্যের একটি মূল ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ প্রক্রিয়াগত শর্ত আরোপের মাধ্যমে বহুবিবাহ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এই আইন অনুযায়ী একজন স্বামীকে তার সব স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে হয় এবং বহু বিবাহের ক্ষেত্রে আগের স্ত্রী অথবা স্ত্রীগণ পরবর্তী বিবাহের জন্য সম্মতি দিয়েছেন মর্মে স্বামীকে স্থানীয় সালিশী পরিষদের অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কাছে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এবং বহু বিবাহের শিকার ৪০ জন মুসলিম নারীর কেউই বহুবিবাহে সম্মতি দেননি কিংবা কোন সালিশী পরিষদের পর্যালোচনার সম্মুখীন হননি বলে জানিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থানীয় সালিশী পরিষদের সদস্যরা খুবই অল্প প্রশিক্ষিত এবং সরকারও বহুবিবাহের বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা তদারকি করেনা। মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হলেও এ সংক্রান্ত দলিলপত্রের সত্যতা যাচাই করা অনেক ক্ষেত্রে বেশ কঠিন, কারণ বিবাহ নিবন্ধনকারী

সেসব দলিলপত্র হাতে লিখে সংরক্ষণ করেন এবং প্রায়শঃ সেসব দলিলপত্রে কারচুপি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে সেসব তথ্য সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। তথ্য সংরক্ষণের এই অব্যবস্থাপনাও পুরুষকে যথাযথ অনুমতি ছাড়া বহুবিবাহের সুযোগ তৈরি করে দেয় ।

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও মুসলিম পারিবারিক আইন নারীর চেয়ে পুরুষকে বেশি সুযোগ তৈরি করে দেয়। সব মুসলিম পুরুষের বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ অধিকার রয়েছে, কিন্তু মুসলমান নারীরা শুধুমাত্র বিবাহ চুক্তিতে স্বামী কর্তৃক স্বীকৃত 'তালাকের অধিকারপ্রাপ্ত' হলেই তবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। সালিশী পরিষদের দ্বারা পর্যালোচিত হওয়ার পর মুসলমান পুরুষের তালাক কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও, বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রক্রিয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ কদাচিৎ ঘটে থাকে।

অন্যদিকে একজন নারী যখন বিবাহ বিচ্ছেদ চান তখন তাকে অবশ্যই তার স্বামীর সম্মতি নিশ্চিত করতে হয়। স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিচ্ছেদ (মোবারাত) ঘটাতে পারেন। মুসলমান নারী খুলা বিচ্ছেদও (পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে এক ধরনের বিচ্ছেদ) চাইতে পারেন। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, নারীদের জন্য খুলা বিচ্ছেদের এই সুযোগ তখনই প্রযোজ্য যখন তাঁরা স্বামীদের অনুকূলে কিছু ছাড় (সাধারণত দেনমোহরের দাবি ছেড়ে দেওয়া) দিয়ে থাকেন। অন্যথায় ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন অনুসারে নারীরা আদালতের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে বিচ্ছেদ চাইতে পারেন। কিন্তু বিচ্ছেদের এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে।

দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকা অবস্থায় স্ত্রীদের ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার মুসলিম পারিবারিক আইন দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ নোটিশের তারিখ থেকে পরবর্তী ৯০ দিন পর্যন্ত অথবা স্ত্রী যদি গর্ভবতী থাকেন তাহলে সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। মুসলিম পারিবারিক আইনে স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ না থাকলেও বাস্তবে এমন মামলাও রয়েছে যেখানে স্ত্রী স্বামীর বাড়ী পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর স্বামী তার বিরুদ্ধে 'অসতী', 'চরিত্রহীন', 'কর্তব্যবিমুখ' ইত্যাদি অভিযোগ আনে এবং সেক্ষেত্রে পারিবারিক আদালত স্ত্রীর বিবাহকালীন ভরণপোষণের অধিকার বাতিল করে দেন। আইনজীবীদের মতে, বিচারকেরা তখনই নারীর বিবাহকালীন ভরণপোষণ আদায়ের জন্য অধিক আগ্রহী হন যখন তারা পারিবারিক সহিংসতা বা যৌতুকের জন্য নির্যাতনের কারণে কিংবা স্বামী-পরিত্যক্ত হয়ে বৈবাহিক বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।

হিন্দু

সীমিত আকারে বিধিবদ্ধ হিন্দু পারিবারিক আইনেও নারীর প্রতি একই ধরনের বৈষম্যমূলক বিধান রয়েছে। হিন্দু পারিবারিক আইন প্রক্রিয়াগত কোন পূর্বশর্ত ছাড়াই হিন্দু পুরুষদেরকে যতবার খুশি বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করেছে। হিন্দু পারিবারিক আইনে পুরুষ অথবা নারী কারোর জন্যই বিচ্ছেদ অনুমোদিত নয়। তবে ১৯৪৬ সনের আংশিক বিধিবদ্ধ হিন্দু পারিবারিক আইন অনুযায়ী হিন্দু নারীরা অত্যন্ত সীমিত কারণে আলাদা বসবাস এবং স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার জন্য পারিবারিক

আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করতে পারেন। তবে এসব সীমিত অধিকারও বাতিল হয়ে যায় যদি আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হয় যে স্ত্রী অসতী বা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন কিংবা দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারে আদালতের জারীকৃত আদেশ মানতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ভরণপোষণ অথবা পৃথক বসবাসের জন্য আবেদন করার সময় প্রথমত হিন্দু নারীদের প্রমাণ করতে হয় যে তারা বিবাহিত। যেহেতু হিন্দু বিবাহের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন নিবন্ধন ব্যবস্থা নেই সেকারণে তাদের বিবাহের তথ্য প্রমাণ হাজির করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ২০১২ সালের মে মাসে বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ হিন্দু বিবাহের ঐচ্ছিক নিবন্ধন বিষয়ে একটি আইনের খসড়া অনুমোদন করেছে।

খ্রিস্টান

খ্রিষ্টান পারিবারিক আইনও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই বিবাহ বিচ্ছেদ সীমিত ক্ষেত্রে অনুমোদিত, কিন্তু নারীর জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। নারীকে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত করে পুরুষ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। অন্যদিকে নারী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার ছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয় যেমন, ধর্মান্তরিত হওয়া, ধর্ষণ, দ্বিতীয় বিবাহ, সমকামিতা, পাশবিকতা, দুই বছর ধরে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা কিংবা নিষ্ঠুরতা ইত্যাদির প্রমাণ করতে হয়। বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজে ব্যভিচারের অভিযোগ আনা, বিশেষত নারীদের জন্য, অত্যন্ত অবমাননাকর।

খ্রিস্টান নারীরা দাম্পত্য সম্পর্কের সময়ে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পর ভরণপোষণ বা খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী, তবে সেই ভরণপোষণ বা খোরপোষ দেওয়া হবে তাদের 'সতীত্ব' বজায় রাখার শর্তে।

নারী এবং তাদের পোষ্যদের উপর পারিবারিক আইনের প্রভাব

বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইনগুলি বিয়ে, তালাক কিংবা বিচ্ছেদের সময় নারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য নানা বিপত্তি ডেকে আনে। এসব আইন নারীর প্রতি সহিংসতা এবং নারী-প্রধান পরিবারে দারিদ্র্য সৃষ্টিতে অবদান রাখে।

এই প্রতিবেদনের জন্য যেসব নারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের অনেকেই জোরপূর্বক কিংবা ফাঁদে পড়ে বিয়েতে বাধ্য হওয়ার কথা জানিয়েছেন। এসব বিয়েতে তারা বাধ্য হয়েছেন, কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল যদি তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামী-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তাহলে তারা গৃহহীন হয়ে পড়তে পারেন এবং নিজেকে পরিচালনার মতো আর্থিক সামর্থ্য তখন তাদের নাও থাকতে পারে। বহুবিবাহের শিকার অনেক মুসলিম নারী জানিয়েছেন যে, বিয়েতে বাধা দিলে তাদের স্বামীরা শারীরিকভাবে নির্যাতন করে এবং স্বামী ছাড়াও সতীনদের হাতে তাদেরকে নিগৃহীত হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফরিদা জানিয়েছেন যে, তার স্বামী এবং অন্য সতীনেরা তাকে উপোস রাখাসহ তার উপর শারীরিক ও মৌখিক নির্যাতন চালাতো। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বামীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার অর্থই হলো আশ্রয়হীন হয়ে পড়া। তিনি

বলেন, "আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তাই তারা যত কিছুই করন্নক না কেন আমি তাদের সাথে থেকে গেছি।"

তালাকপ্রাপ্ত কিংবা স্বামী-বিচ্ছিন্ন অধিকাংশ নারী তাদের ভয়ানক অর্থনৈতিক দুর্গতির বিবরণ দিয়েছেন। বৈবাহিক বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, রাস্ত্মায় বসবাস, খাদ্যের জন্যে ভিক্ষা করা, মাথা গোঁজার আচ্ছাদনের জন্য অন্যের ঘরে ফাইফরমাশ খাটা, স্কুল থেকে বাচ্চাদেরকে আনা-নেওয়া করা, ভগ্নস্বাস্থ্যের সাথে সংগ্রাম, ভয়ানক অর্থকষ্টে দিনযাপন প্রভৃতি এসব দুর্গতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। উদাহরণস্বরূপ অসীমা জানিয়েছেন, তার স্বামী তাকে বৈবাহিক বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন এবং তিনি কোন ভরণপোষণ কিংবা বৈবাহিক সম্পত্তির অংশ পাননি। তিনি তার ১০ বৎসর বয়সী কন্যাকে অন্যের ঘরে গৃহশ্রমিকের কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দেন এবং নিজে ছোট মেয়েকে নিয়ে রাস্ত্মায় ভিক্ষা করে দিনযাপন করতে থাকেন। একজন সহৃদয় ভূ-স্বামী নিজের ক্ষেতে কাজ করার বিনিময়ে অসীমাকে খাদ্য ও আশ্রয় দানের প্রস্ত্মাব না দেওয়া পর্যন্ত্ম তার এই অবস্থা চলতে থাকে। অন্যদিকে মোনা'র স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে এবং একটি গর্ভপাত হয়ে যাওয়ার পরও মোনা'র স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য কোন টাকা পয়সা না দিয়ে সে অন্য আরেকজন নারীকে বিয়ে করে বসে। এরপর মোনা কোন উপায়ান্ত্মর না দেখে তার বিধবা হতদরিদ্র মায়ের কাছে আশ্রয় নেন।

আদালতে লড়াই

বাংলাদেশের পারিবারিক আইনগুলি কার্যকর করার প্রাথমিক দায়িত্ব হলো পারিবারিক আদালতের। কিন্তু বাস্ত্মবে দেখা যায়, পারিবারিক আদালত প্রক্রিয়াগত এবং প্রশাসনিক নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত্ম। আইনজীবী, সাবেক বিচারক এবং অধিকার কর্মীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানিয়েছেন যে, আদালতের আদেশ কার্যকর করতে বছরের পর বছর পার হয়ে যেতে পারে। সমনজারি কিংবা নোটিশ সংক্রান্ত্ম ঝামেলার কারণে কোর্টের রায়ের কার্যকারিতা আরও বিলম্বিত হয়। এক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য সিতারার দীর্ঘ অপেক্ষার ঘটনাটি উলেস্নখ করা যেতে পারে। স্বামী তাকে তালাক দেওয়ার পর আইনী সহায়তা পাওয়ার জন্য আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটি সিতারাকে উদ্বুদ্ধ করেছে তা তিনি হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানিয়েছেন। তিনি বলতে থাকেন - "আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে সে আমার জন্য কোন কিছুই দেয়নি। এমনকি এক টুকরো কাপড়ও না। আমি সারাবেলা (খাবারের জন্যে) ভিক্ষা করি। আমি যখন তাকে বললাম, আমি আদালতে যাচ্ছি, সে ঠাট্টা করে বললো, 'যা, আদালতে যা, কিচ্ছু পাবি না।' আমি আদালত থেকে কিছু একটা কখন পাবো ?"

পারিবারিক আইন বাস্ত্মবায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান অন্যান্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে সাক্ষ্য সংক্রান্ত্ম বিষয়ে বিচারকদের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ, অনিশ্চিত রায়, অন্ত্মর্বর্তীকালীন ভরণপোষণের আদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া, ভরণপোষণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট মানদ- না থাকা প্রভৃতি।

বাংলাদেশের পারিবারিক আইনে যদিও উলেস্নখ আছে যে, বিচারকেরা ভরণপোষণ দেওয়ার পড়্রো রায় ঘোষণা করতে পারেন, কিন্তু এর পরিমাণ বা শর্ত কী হবে সে ব্যাপারে আইনে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম পারিবারিক আইনে ভরণপোষণের পরিমাণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো উলেস্নখ নেই, যদিও সেখানে বলা হয়েছে যে, স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর জন্য 'পর্যাপ্ত পরিমাণ' ভরণপোষণ নিশ্চিত করা। অপরদিকে হিন্দু আইনে উলেস্নখ আছে যে, আদালত "দু'পক্ষের সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে এবং স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে" ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। খ্রিস্টান কিংবা অন্য যারা কোনো ধর্মীয় আইন না মেনে বিশেষ বিবাহ আইনে বিয়ে করেন, তাদের ক্ষেত্রে ভরণপোষণ নির্ধারণে বিচারক সংশিস্নষ্ট নারীর 'ভাগ্য', তার স্বামীর ভরণপোষণ দেওয়ার সামর্থ্য কিংবা উভয় পক্ষের আচরণ বিবেচনায় নিতে পারেন। বাস্তবে দেখা যায়, বিচারকেরা রায় প্রদানের ড়্রোত্রে স্বামীর ভরণপোষণ দেওয়ার সামর্থ্য এবং স্ত্রীর অভাব অভিযোগকে বিবেচনায় নিয়ে থাকেন। কিন্তু এসব সামর্থ্য বা অভাব নির্ধারণের মানদ- বেশ অস্পষ্ট। অনেক সময় দেখা যায়, স্বামীরা তাদের স্ত্রী 'অসতী' 'কর্তব্যবিমুখ' বা 'চরিত্রহীন' ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে ভরণপোষণের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে থাকে।

অন্যান্য দেশে ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণে অধিকতর সুস্পষ্ট আইনী মানদ- রয়েছে। প্রায় ড়্রোত্রে দাম্পত্য সম্পর্কের মেয়াদ, নির্ভরশীল ব্যক্তির শিড়্রা ও উপার্জন ড়্রামতার উপর সন্তানদের দেখাশুনা এবং সাংসারিক দায়িত্ব পালনের প্রভাব, স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের আয়, তাদের বয়স ও স্বাস্থ্য এবং একজনের পেশাগত উন্নয়নে আরেকজনের অবদান প্রভৃতি বিষয় এসব মানদ-ের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ভরণপোষণ বা *মোহরানা* সংক্রান্ত বিষয়ে কোর্টে হাজিরা দেওয়ার জন্য স্বামীকে যে সমন ও নোটিশ দেওয়া হয় সেখানেও নানা সমস্যা থাকে। অনেক ড়্রোত্রে বিচারকেরা আইনত যে সময় নির্ধারিত থাকে তা মেনে চলেন না। আবার যেসব কর্মকর্তা সমন জারি করেন তারা ঘুষ খান। এসব সমস্যার জন্য পারিবারিক আদালতের মামলা নিষ্পত্তি হতে অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। বাংলাদেশ আইন কমিশন ২০১০ সালে সমন ও নোটিশ জারির প্রক্রিয়া সংশোধনের সুপারিশ করেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত দেশের সংসদ কিংবা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় উলেস্নখিত সংশোধনী বাস্তবায়ন করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

ভরণপোষণ বা মোহরানার দাবিদার মুসলিম নারীকে প্রথমেই প্রমাণ করতে হয় যে তিনি বিবাহিতা। হিন্দু নারীদের বেলায় এটি একটি প্রধান সমস্যা, কেননা হিন্দু বিয়েতে রেজিস্ট্রির কোন চর্চা নেই। মুসলিম নারীদের বেলায়ও এই নিয়মটি সমস্যার সৃষ্টি করে, কারণ শরা শরিয়ত মতে বিবাহে কোন লিখিত প্রমাণ থাকে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়েতে রেজিস্ট্রেশনের চর্চাটি নানা জটিলতায় আক্রান্ত এবং নিবন্ধনের দলিলপত্র কম্পিউটারে কিংবা কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাও নেই। দালিলিক প্রমাণপত্র যদি না থাকে তাহলে বিচারকেরা মৌখিক তথ্যপ্রমাণ বিবেচনায় নিতে পারেন, সেটি আইনেই বলা আছে। কিন্তু আইনজীবীরা জানান যে এটি তখনই সম্ভব হয় যখন সংশিস্নষ্ট নারীর কোন সন্তান থাকে। আইনসিদ্ধভাবে বিয়ে হয়েছে তা প্রমাণে ব্যর্থ হলে নারীরা কোনো কিছুই দাবি করতে পারেন না।

যেসব নারী মনে করেন যে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক আইনসিদ্ধ এবং সেই বিশ্বাসে দাম্পত্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, কিন্তু পরে দেখতে পান যে পরিস্থিতি ভিন্ন; সেসব নারীর জন্য কোনো আইনী সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই।

তাছাড়া যেসব নারী ভরণপোষণের বা মোহরানা প্রাপ্তির লড়াইয়ে জয়যুক্ত হন, তাদের লড়াই কিন্তু শেষ হয় না। স্বামীর কাছ থেকে পাওনা আদায়ের জন্য নারীকে রায় কার্যকর করার আদেশ বাস্ত্মবায়নের আবেদন করতে হয় এবং স্বামীর সম্পদ ও আয়ের প্রমাণাদি দাখিল করতে হয়। এই কাজটি অধিকাংশ নারীই করতে পারেন না। রায় বাস্ত্মবায়নের জন্য আবেদন দাখিল করেছেন এমন নারীদের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কথা বলে জেনেছে যে বছরের পর বছর অতিক্রান্ত্ম হলেও তারা আদালতের রায় বাস্ত্মবায়নের আদেশ পাচ্ছেন না। ভরণপোষণের আদেশ কার্যকর হতে এক মক্কেলের ১৮ বছর সময় লেগেছিল বলে জানিয়েছেন একজন আইনজীবী। আবার একজন বিচারক জানিয়েছেন, সেই ১৯৮০ সালে দায়ের করা মামলা ২০১১ সালের জুন মাসেও বাস্ত্মবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়ে গেছে। কোন এক নারী মক্কেলের কথা উলেস্নখ করে একজন আইনজীবী জানিয়েছেন, তার সেই মক্কেল তাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমি কি অন্ত্মত মরে যাওয়ার আগে আমার পাওনা পাবো ?" ভরণপোষণের রায় প্রদান সংক্রান্ত্ম কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে ২০১০ সালে বাংলাদেশ আইন কমিশন একটি সুপারিশ পেশ করে। সেটি হলো, প্রাথমিক অবস্থায় ভরণপোষণ দাবির পাশাপাশি ভরণপোষণের রায় বাস্ত্মবায়নের জন্যও আগাম আবেদন পেশ করা যাবে। তবে সরকার এখনও এ বিষয়ে কোনো সংশোধনী গ্রহণ করেনি।

পারিবারিক আদালতে ভরণপোষণ কিংবা মোহরানার দাবিদার নারীর আসল যুদ্ধটা শুরম্ন হয় স্বামীর দায়ের করা মিথ্যে ও হয়রানিমূলক পাল্টা মামলার সময়টাতে। ফৌজদারী মামলাও অনেককে সামলাতে হয়। স্বামীর দায়ের করা 'দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরম্নদ্ধারের' আবেদন অনেক সময় স্ত্রীর জন্য একটি গুরম্নতর সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। এই মামলায় আদালত স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বিভিন্ন সময়ে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরম্নদ্ধারের অনেক মামলাকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিলেও স্বামীদের পড়্গা থেকে এ ধরনের হয়রানিমূলক পাল্টা মামলা দায়েরের প্রচলিত ধারা এখনো অব্যাহত আছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে, স্ত্রী যদি ঘর ছাড়ার সময় নিজের ব্যবহার্য কোন জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যায়, তবে স্বামীরা চুরির মামলা ঠুকে দেয়। প্রায় ড়্গেত্রে স্বামীরা এসব ফৌজদারি অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেও বেশিরভাগ সময় দেখা যায় সেসব অভিযোগের কারণে স্ত্রী এবং তার পরিবারের লোকজন নানাভাবে ভয়ভীতি ও হয়রানির আতঙ্কের মধ্যে থাকেন।

সামাজিক সহায়তা

ভরণপোষণ সংক্রান্ত্ম বিষয়ে আদালতে জয়ী হলেও অনেক নারীর কাছে এই বিজয় একটি 'নিষ্ফল' দৌঁড়ঝাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ অনেক সময় দেখা যায় তাদের স্বামীরা খুবই দরিদ্র। ফলে টাকা জোগাড়ের সামর্থ্য অনেকেরই থাকে না। এই সমস্ত্ম নারীর জন্য রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা খুবই দরকার। বিশেষ করে তালাকপ্রাপ্ত বা আলাদা থাকেন অথবা পারিবারিক সহিংসতা এড়াতে চান এমন নারীদের

জরম্নরী ভিত্তিতে আশ্রয় দরকার হয়ে পড়ে। সামাজিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হবার পর থেকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়টাতে।

সামাজিক নিরাপত্তা জাল কর্মসূচিতে বাংলাদেশের বেশ গুরম্নত্বপূর্ণ অর্জন রয়েছে। তবে এসব প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ কিংবা এর যোগ্য বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদেরকে প্রচুর সমস্যায় পড়তে হয়। সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির প্রত্যাশিত লক্ষ্য পূরণে এর পরিচালনা ব্যবস্থাকে আরও বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করতে হবে। এই প্রকল্পগুলি অসহায় নারীদের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধিতা, বয়স ও দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে যাদের জীবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, তাদের সমস্যা ও দুরাবস্থার পর্যাপ্ত সমাধান দিতে পারছেনা। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ২০১১ সালে বিদ্যমান সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিগুলির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি সমন্বিত জাতীয় কৌশল প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

দেশে নারীদের জন্য সাতটি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। তবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাথে আলাপকালে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন যে বাস্তবে এমন আশ্রয় কেন্দ্র আরও দরকার। গৃহহীন নারী এবং যেসব নারী ভিক্ষা করেন তাদেরকে ভবঘুরে আইনের আওতায় ভিক্ষাবৃত্তি ও রাস্তায় বাস করার অপরাধে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশে এ আইনটি বেশ অস্পষ্ট এবং ভিক্ষাবৃত্তি আইনত অপরাধ হিসেবে গণ্য। আইনটির সংশোধন দরকার, বিশেষ করে এখানে আশ্রয়হীনতার জন্য দন্ডের যে বিধান রয়েছে সেটির সংশোধন দরকার। গৃহহীন নারীদের সাময়িক আশ্রয় লাভের অধিকারের বিষয়টিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের জন্য বেশ কিছু আকর্ষণীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি রয়েছে। যেমন বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্ত (স্বামী-বিচ্ছিন্ন বা তালাকপ্রাপ্ত) নারীদের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা কর্মসূচিটি এক্ষেত্রে একটি উলেস্নখযোগ্য উদাহরণ। আর্থিক প্রয়োজনীয়তায় বিষয়টি প্রমাণ করতে পারলে নারীরা এ কর্মসূচিতে প্রতিমাসে ৩০০ টাকা পেয়ে থাকেন।

তবে কিছু কিছু বিষয়ের জন্য এই কর্মসূচিটি বাধাগ্রস্ত হয়। সাহায্য পাওয়ার যোগ্য অনেক নারীই এ কর্মসূচি সর্ম্পকে জানেন না। অনেক নারী মনে করেন, কর্মসূচিতে বরাদ্ধ সাহায্যের পরিমাণ এত কম যে সেটি তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। অনেক সময় টাকা পেতেও বেশ সময় লেগে যায়। পারিবারিক আদালত এসব সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির সাথে যুক্ত নয়। অথচ এসব আদালতে অনেক নারীই আসেন যাদের সাহায্য দরকার। কিন্তু এই আদালত থেকে তারা সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কোনো তথ্য পান না।

সরকারি খাস জমি ভূমিহীন গ্রামীণ মানুষদের মাঝে বিতরণের একটি নীতিও সরকারের রয়েছে যা থেকে নারী প্রধান পরিবারগুলি উপকার পেতে পারে। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে যারা কাজ করেন তারা হিউম্যান

রাইটস ওয়াচকে জানান যে নারী-প্রধান সেই পরিবারগুলিই এই নীতিমালার আওতায় সুবিধা পেতে পারে, যে পরিবারে একজন 'সড়াম' ছেলে সন্তান রয়েছে। যেসব পরিবারে একজন কন্যা সন্তান রয়েছে অথবা কোন সন্তান নেই অথবা ছেলে থাকলেও সে যদি প্রতিবন্ধী হয়, তবে এই বৈষম্যমূলক নীতির কারণে নারী-প্রধান পরিবার হওয়া সত্ত্বেও তারা জমির অধিকার পাবে না।

নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত বেশ কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সাক্ষরকারী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এসব চুক্তি সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারসহ দাম্পত্য জীবনে এবং এর পরিসমাপ্তিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য সমানাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত চুক্তির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক বা ধর্মীয় অজুহাতে বা স্বামী তার স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় এই যুক্তিতে বিয়ের পর নারীদের সম্পত্তিতে সমান অধিকার না দেবার যুক্তিটিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর ভরনপোষণের বিষয়টি আরো যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য আইনী সংস্কারের তাগিদ দেয়। বাংলাদেশ সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনার এক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণের সময়সীমা অত্যন্ত কাছাকাছি চলে এলেও বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইনের দ্বারা সৃষ্ট দারিদ্র্য নিরসনের উদ্যোগ এখনও অত্যন্ত সীমিত।

বাংলাদেশ সরকার তার আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার তাগিদে হিন্দু বিবাহের ঐচ্ছিক নিবন্ধন চালু করার ব্যাপারে একটি বিল অনুমোদন করেছে। ছোট একটি পদক্ষেপ হলেও এটি বেশ গুরন্নত্বপূর্ণ। পারিবারিক আইন ও নানাবিধ প্রক্রিয়ার সংস্কার নিয়ে আইন কমিশনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে সরকার সহযোগিতা করছে। নারী-পুরন্নষের সমতা প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বাংলাদেশের নারীদের দুর্দশা লাঘবের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিশ্রন্নতি বাস্তবায়নে এই সংস্কারগুলিকে এগিয়ে নেওয়া অত্যন্ত গুরন্নত্বপূর্ণ।

পরিবর্তনের এই ধারা থেকে আরও সুবিধা পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের গ্রহণ করা উচিত।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং সুশীল সমাজের সংগঠন ও প্রতিনিধি যারা নারী অধিকার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে কাজ করেন তাদের সাথে পরামর্শক্রমে বিবাহ, বিচ্ছেদ (পৃথক বসবাস), তালাক এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনের ব্যাপক সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করুন। ভুক্তভোগী সকল পক্ষ বা সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে ধর্ম কিংবা নারী-পুরুষ কেন্দ্রিক বৈষম্যের বিধানমুক্ত বিভিন্ন দেওয়ানি আইন প্রণয়নের জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া চালু করুন। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পারিবারিক আইন সংশোধনের মাধ্যমে এর বৈষম্যমূলক দিকগুলো দূর করুন এবং আইন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া জোরদার করুন।

এই লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন:

ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইনের সংস্কার:

- ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পারিবারিক আদালতের বিচারকদের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট মানদ- তৈরী করুন। এই মানদ- বিবেচ্য বিষয় হবে: দাম্পত্য সম্পর্কের মেয়াদ; দম্পতির নির্ভরশীল পক্ষের (এ ক্ষেত্রে সাধারণত স্ত্রীর) শিক্ষালাভ এবং উপার্জন ক্ষমতার উপর পরিবারের শিশু পরিচর্যা ও সাংসারিক দায়-দায়িত্বের প্রভাব; স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্ভাব্য আয়; নির্ভরশীল পক্ষের (স্ত্রীর) নিজেকে নিজে ভরণপোষণের সামর্থ্য; স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য এবং বয়স; নির্ভরশীল পক্ষের চাহিদা/অভাব এবং জীবনযাত্রার মান; জীবন-জীবিকার অন্যান্য উপায়; এবং অপর পক্ষের পেশাগত উন্নয়নে নির্ভরশীল পক্ষের অবদান।

- স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকারের সাথে তার 'আনুগত্য', 'সতীত্ব', 'বৈবাহিক কর্তব্য', অথবা 'চারিত্রিক সততা' প্রভৃতি মানদ-ের সম্পর্ক বিলুপ্ত করুন।

- পারিবারিক আদালত ও আপীল সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করুন এবং দীর্ঘসূত্রিতা কমানোর জন্য সেসব প্রক্রিয়াকে যুগোপযোগী করুন। ভরণপোষণের মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিচারকদের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদানের যে ক্ষমতা রয়েছে সেটিকে অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ প্রদানের জন্য ব্যবহার করতে পারিবারিক আদালতগুলির প্রতি জরুরী নির্দেশনা জারী করুন। বিচ্ছেদ, তালাক, ভরণপোষণ এবং মোহরানা সংক্রান্ত মামলাগুলি যাতে পারিবারিক আদালতে স্বাধীনভাবে ও স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করা যায় সেজন্য পারিবারিক আদালতগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করুন। মামলাজট এবং মামলার দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এজন্য পারিবারিক আদালতে

আরও বিচারক নিয়োগের অথবা বিচারকদের উপর থেকে অন্যান্য দেওয়ানি মামলার ভার কমানোর ব্যবস্থা নিন। এর পাশাপাশি সমন জারী এবং আদালতের রায়/ডিক্রি বাস্তবায়ন পদ্ধতির সংস্কার সাধন করুন।

- বৈবাহিক সম্পত্তির ধারণার পূর্ণ স্বীকৃতি দিন এবং দাম্পত্য সম্পর্ক অবসানের সময় নারীদের আর্থিক এবং অর্থ-বহির্ভূত অবদানসমূহের স্বীকৃতি দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পত্তি সমান ভাগে বন্টন করার ব্যবস্থাকে অনুমোদন করুন। সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য এই বিধান প্রযোজ্য হবে।

- বিভিন্ন গণমাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করুন এবং তা যেন প্রতিবন্ধীবান্ধব হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন। এই প্রচারণায় বৈবাহিক বাড়িতে বসবাসের অধিকার, অর্থনৈতিক ক্ষতির বিপরীতে সুরক্ষা, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করুন। পারিবারিক সহিংসতা বিরোধী আইনের আওতায় নারীদের প্রতিকার চাওয়াকে উৎসাহিত করুন।

- সব ধর্মের অনুসারীদের জন্য বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করুন। বিবাহের প্রমাণ হিসেবে সারা দেশের মানুষের কাছে সহজলভ্য হয় এমনভাবে বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিন।

- বিবাহবিচ্ছেদে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করুন।

- বহুবিবাহের নেতিবাচক ফলাফল এবং তার সাথে পারিবারিক সহিংসতার সম্পর্ক বিষয়ে দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ নিন এবং এই ব্যবস্থা অবসানের জন্য কাজ করুন। এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যাতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাওয়া যায় এবং সেসব তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থাটি যাতে প্রতিবন্ধী বান্ধব হয় তা নিশ্চিত করুন।

- বাস্তবে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রথা বাতিলে প্রণীত আইন (যদি থাকে) যাতে বহুবিবাহের শিকার স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের সম্পত্তি, মোহর এবং ভরণপোষণ প্রাপ্তিসহ যাবতীয় অধিকারের সুরক্ষা দেয়, তা নিশ্চিত করুন। বহুবিবাহ প্রথা বাতিল করে কোন আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, পুরুষের একাধিক বিয়ে করার সামর্থ্যকে রোধ করতে পারে এমন আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করুন। এছাড়া স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য বা অবস্থার সুস্পষ্ট তথ্যপ্রমাণসহ আগের স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণের শর্তাবলী এবং বিবাহের নোটিশের সময়কাল প্রলম্বিত করার ব্যবস্থা নিন।

- বিদ্যমান সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি, এতে সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি এবং আবেদনের নিয়ম বিষয়ে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই সম্পর্কিত তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করুন এবং তথ্যপ্রাপ্তির ব্যবস্থা যাতে প্রতিবন্ধীবান্ধব হয় তা নিশ্চিত করুন। বিদ্যমান সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিসমূহের সাথে পারিবারিক আদালতগুলির একটা যোগসূত্র বা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করুন।

পূর্ণাঙ্গ সুপারিশমালার জন্য সপ্তম অধ্যায় দেখুন।

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

এই প্রতিবেদটি ২০১১ সালের মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পরিচালিত মাঠ গবেষণার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। গবেষণার জন্য গৃহীত সাক্ষাৎকারগুলি ঐ বছরের মার্চ থেকে জুনের মধ্যবর্তী সময়ের এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যাপ্তিকাল প্রায় ছয় সপ্তাহ।

ঢাকা শহর, মাদারীপুর, গাজীপুর ও নোয়াখালি জেলায় এসব সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ঢাকা শহরের ওপর বিশেষ জোর দেওয়ার কারণ এখানে নানা ধর্মের লোক বাস করেন এবং এক বিরাট সংখ্যক স্বামীবিচ্ছিন্ন এবং তালাকপ্রাপ্ত নারী পারিবারিক আদালতে ভরণপোষণ আদায়ের মামলা করেছেন। জেলাগুলো থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়ার কারণ সেখানেও নানা ধরনের জনগোষ্ঠী এবং ভূমিহীনসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর মানুষ বাস করেন। এ পাঁচটি জায়গায় নেওয়া সাক্ষাৎকারে কিছু উত্তরদাতা স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া (separation) ও বিবাহ বিচ্ছেদের (divorce) বিবরণ দিয়েছেন যা ঘটেছে দেশের অন্য কোনো অঞ্চলে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর একজন গবেষক ২৫৫ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের বিন্যাস নিচে দেওয়া হলো:

- ৭১ জন মুসলমান, ৪৫ জন হিন্দু এবং ৪ জন খ্রিস্টান নারীর ব্যক্তিভিত্তিক বা ছোট দলভিত্তিক সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে যেখানে তাঁরা বিয়ে, স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তালাক বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন।
- ৯৬ জন আইনজীবী, অধিকার কর্মী ও গবেষকের ব্যক্তি ও ছোট দল ভিত্তিক সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।
- ৫ জন পারিবারিক আদালতের প্রাক্তন বিচারক (যাঁদের সকলে আগের দু'বছরের কোনো সময়ে পারিবারিক আদালতের বিচারক ছিলেন এবং বিবাহ, স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও তালাকের মামলার বিচারিক দায়িত্ব পালন করেছেন), ৫ জন কাজী বা মুসলিম বিবাহ নিবন্ধনকারী, ৫ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং ৯ জন সরকারী কর্মকর্তা।

ব্যক্তিভিত্তিক সাক্ষাৎকারের জন্য নারীদের চিহ্নিত করতে স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং এসব সাক্ষাৎকারের অধিকাংশ নেওয়া হয়েছে এনজিওগুলোর কার্যালয়ে। গ্রামে গিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা নারীর বাড়ি বা উঠানে বসে কথা বলা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব একান্তে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য, উত্তরদাতা না চাইলে যে সাক্ষাৎকার যে নেওয়া হবে না এবং কীভাবে এসব সাক্ষাৎকার ব্যবহৃত হবে তা সব উত্তরদাতাকে অবহিত করা হয়েছে। প্রত্যেকে সাক্ষাৎকার প্রদানে মৌখিক সম্মতি দিয়েছেন। যেসব নারী তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন বিশেষ করে তাঁদের জানানো হয়েছে তাঁরা চাইলে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর না-ও দিতে

পারেন বা যে কোনো সময় চাইলে সাক্ষাৎকার প্রদান থেকে বিরত হতে পারেন। প্রতিটি সাক্ষাৎকার আধা ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং প্রদানকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলা বা ইংরেজীতে গ্রহণ করা হয়েছে। একজন অনুবাদকের সাহায্যে বাংলায় সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে উত্তরদাতা নারী যাতে আরো বেদনার শিকার না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কিছু নারীকে স্থানীয় আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার কাছে যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য কাউকে সম্মানী দেওয়া হয়নি কেবল সাক্ষাৎকার প্রদানের জায়গায় যাতায়াতের খরচ দেওয়া হয়েছে।

এ প্রতিবেদনের জন্য যেসব বিবাহিত, স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন ও তালাকপ্রাপ্ত নারী সাক্ষাৎকার দিয়েছেন গোপনীয়তা রক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের সকলকে ছদ্মনামে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য যেসব তথ্য তাঁদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে সেগুলোও তাঁদের অনুরোধে উহ্য রাখা হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশ সরকার, জাতিসঙ্ঘ, একাডেমিক, এনজিও এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক আইন, নীতিমালা, জরিপ ও প্রতিবেদনও পর্যালোচনা করেছে।

এ প্রতিবেদনের পরিসর মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান এ তিন প্রধান ধর্মের বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইনের কারণে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর ওপর যে প্রভাব পড়ে তার বিশ্লেষণের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধরা পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইনের আওতায় পড়েন। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের অন্যান্য বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়নি অথবা এসব আইনের বিবর্তনের ইতিহাস বা ঔপনিবেশিক আমলে এসব আইন প্রণয়নকে ঘিরে যে রাজনীতি ছিল পর্যালোচনা করা হয়নি। এসব বিষয়ে অন্যত্র অনেক আলোচনা, পর্যালোচনা ইত্যাদি রয়েছে।

এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর প্রথাগত আইনও আলোচিত হয়নি। এ প্রতিবেদনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় যে পারিবারিক আদালত তা এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপিত হয়নি যেখানে ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাস করে।

যেসব ক্ষেত্রে নারীরা তাঁদের স্বামীগৃহ থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন এবং স্বামী থেকে আলাদা হয়ে বাস করছেন সেসব ক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপ যদি না-ও থাকে তবুও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ একে 'স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস' (separation/separated) বলে অভিহিত করেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ 'পরিত্যাগ' বা 'পরিত্যক্ত' (abandonement/abandoned) শব্দ ব্যবহার করেছে যেসব ক্ষেত্রে স্বামী কোথায় যাচ্ছেন বা কোথায় আছেন তা না জানিয়ে স্ত্রীকে ফেলে চলে গেছেন। মনে রাখতে হবে 'স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস' এবং 'পরিত্যাগ' উভয় ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী বিবাহ তখনও বিদ্যমান।

১. নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান এবং বিয়ের ফলাফল

তিনি আমাকে বললেন, "আমার স্বামী আমার মাথার ওপর ছাদ দিয়েছে
আর তিনবেলা আমার খাবার যোগাচ্ছে। যদি আমি তাকে ছেড়ে যাই
আপনি আমাকে তা দিতে পারবেন?"
– বশির আল-হোসেন, আইন সচিব, জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা (National Grassroots Disability Organization), ঢাকা, মার্চ ৩০, ২০১১, পারিবারিক নির্যাতনের শিকার এক নারী তাঁকে এ প্রশ্ন করেছিলেন।

প্রেক্ষাপট

কর্মসংস্থান ও সম্পত্তির মালিকানা থেকে শুরন্ন করে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক সূচকের নিরিখে বাংলাদেশের নারীরা পুরন্নষদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। এখানে বিবাহ নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি উৎস, কিন্তু অন্যদিকে তা আবার কর্মসংস্থান ও আর্থিক সম্পদের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ অধ্যায়ে নারীর সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিবাহ নারীর জন্য যে অর্থনৈতিক ব্যঞ্জনা বহন করে তার প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিবাহবিচ্ছেদ এবং স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নারী বৈষম্যপূর্ণ পারিবারিক আইনের কারণে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা আলোচনা করা হয়েছে।

নারীর অর্থনৈতিক অবস্থার পটভূমি

বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে পুরন্নষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম। ২০০৯ সালের সর্বশেষ একটি সরকারি জরিপে দেখা যায় ১৫ বছর ও এর উর্ধ্বে পুরন্নষদের ৮৭ শতাংশ আয়মূলক কাজে জড়িত, এর বিপরীতে ১৫ বছর ও এর উর্ধ্বে নারীদের মাত্র ৩০ শতাংশ আয়মূলক কাজ করছে[১] এবং "মজুরিবিহীন পারিবারিক শ্রমে নারীর অংশগ্রহণ পুরন্নষের তুলনায় অনেক বেশি।"[২]

এমনকি মেয়েরা যখন আয়মূলক কাজ করতে যান তখনও তাঁরা মজুরি-বৈষম্যের শিকার হন এবং নারী ও পুরন্নষের আয়ের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে।[৩] আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০০৮ সালে মজুরি

---

[১] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, "রিপোর্ট অব মনিটরিং অব এমপস্নয়মেন্ট সার্ভে ২০০৯," তারিখবিহীন, http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Latest%20Statistics%20Release/employsurvey_09.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ১৯ জানুয়ারি ২০১১), পৃ. ২-৩। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, "নারীর সক্রিয়তা কম হওয়ার অন্যতম কারণ বাড়ির সাংসারিক কাজই নারীর প্রধান কাজ এ ধরনের মনোভাব।"

[২] পূর্বোক্ত, পৃ.৪

[৩] উদাহরণ হিসাবে দেখুন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, "ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-২০১৫)," প্রথম অংশ, http://www.plancomm.gov.bd/SFYP-PDF-Final%2029-08-2011/SFYP-Final-%20Part-1-17-08-11[1].pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ১৮ই ডিসেম্বর ২০১১), পৃ. ১৫৩, (বলা হয়েছে নারীপ্রধান পরিবারগুলো সাধারণত কম আয় করে যেহেতু নারীর উপার্জনের সামর্থ্য পুরন্নষের তুলনায় কম এবং মজুরিও তাঁরা পুরন্নষের চেয়ে কম পান।

বৈষম্য সংক্রান্ত জরিপে দেখেছে বাংলাদেশের নারীরা পুরুষের চেয়ে ঘণ্টায় ২১ শতাংশ কম আয় করেন।[৪] জমি এবং অন্যান্য সম্পদের ওপরও নারীর মালিকানা পুরুষের তুলনায় অনেক কম। ২০০৮ সালের কৃষি শুমারি প্রতিবেদন (এ সংক্রান্ত পুরোপুরি প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর মধ্যে সাম্প্রতিকতম) অনুযায়ী মোট কৃষি জমির মাত্র ২.৯৫ শতাংশের মালিক নারী।[৫] ২০১১ সালে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে "পুরুষ-প্রধান খানা" "নারীপ্রধান খানার" চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি জমির মালিক।[৬]

নিজেদের নামে জমি রেজিস্ট্রি করার ক্ষেত্রেও নারীরা সমস্যার সম্মুখীন হন। ভূমি রেজিস্ট্রি কার্যালয়গুলো অন্যান্য দেশের কার্যালয়ের মতোই পুরুষ কর্মী দ্বারা পূর্ণ যা একটি রক্ষণশীল সমাজের নারীদের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে।[৭] ভূমি রেজিস্ট্রি প্রক্রিয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পূর্ণ যা নারীদের জন্য বিশেষ করে একটি বড় বাধা কেননা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সাক্ষারতার দিক থেকে তাঁরা পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছেন। তাছাড়া ভূমি রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের দুর্নীতি সম্পর্কেও ইতিমধ্যে অনেক প্রতিবেদনে উলিস্নখিত হয়েছে।[৮]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনগণের সম্পদের অধিকার ও মালিকানার ওপর ভিত্তি করে দেশটির মূল্যায়নকারী সংস্থা দ্য ইন্টারন্যাশনাল প্রপার্টি রাইটস ইনডেক্স নারীর সম্পদের ওপর মালিকানার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থা যথেষ্ট খারাপ বলে মত দিয়েছে। সংস্থাটির সূচকে ওইসিডিভুক্ত নয় এমন ৮৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮১ নম্বরে নির্দেশ করেছে। শুধুমাত্র চাদ ও জিম্বাবুয়ে বাংলাদেশের চেয়ে নিচে আছে।[৯]

---

[৪] স্টিভেন ক্যাপসস, "দি জেন্ডার ওয়েজ গ্যাপ ইন বাংলাদেশ," ২০০৮, আইএলও-এশিয়া-প্যাসিফিক ওয়ার্কিং পেপার সিরিজ, আইএলও কার্যালয়, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/publication/wcms_098063.pdf (দেখা হয়েছে ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১১)।

[৫] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি শুমারি ২০০৮, নভেম্বর ২০১০,
দেখুন: http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/CenAgri2008/DetailedTable.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২৭ আগষ্ট ২০১১), টেবিল - ১, পৃষ্ঠা ৫১।
বিশ্বব্যাংক, "হুইসপার টু ভয়েসেস: জেন্ডার এন্ড সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন ইন বাংলাদেশ," বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সিরিজ, পেপার নং ২২, ২০০৮, দেখুন: http://siteresources.worldbank.org/INTBANGLADESH/Resources/295657-1205740286726/genderReport.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ৩ নভেম্বর ২০১১), পৃ. ৭৬, প্যারা ৫.১১। ২০০৬ সালে পরিচালিত বিশ্ব ব্যাংক জে-ার মূল্যবোধ জরিপ-এ দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে বাবা-মার কাছ থেকে জমি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বয়সী নারীর (৪৫-৬০ বছর) তুলনায় কম বয়সী (১৫-২৫ বছর বয়সী) নারীদের ক্ষেত্রে বেড়েছে।

[৬] জাতিসঙ্ঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, "দ্য স্টেট অফ ফুড এন্ড এগ্রিকালচার ২০১০-১১", ২০১১,
দেখুন: http://www.nfpcsp.org/agridrupal/sites/default/files/StateofFood&Agriculture2011_0.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২০ জানুয়ারি, ২০১২), পৃ. ২৩-৪।

[৭] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কর্তৃক গৃহীত জিনাত আরা হকের সাক্ষাৎকার। জিনাত উই ক্যান অ্যালায়েন্স টু এন্ড ডোমেসটিক ভায়োলেন্স-এর জাতীয় সমন্বয়ক। সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে ঢাকায়, ২৮শে মার্চ ২০১১।

[৮] উদাহরণ হিসাবে দেখুন: ট্র্যান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, "করাপশন ইন দ্য সার্ভিস সেক্টর: ন্যাশনাল হাউজহোল্ড সার্ভে, ২০১০," ডিসেম্বর ২০১০, http://bangladesh.org/research/Executive%20Summary_23122010%20FINAL.pdf (দেখা হয়েছে ২৫শে মে ২০১২)। খানা জরিপটিতে দেখা গেছে উত্তরদাতারা সরকারি সেবাগুলোর মধ্যে ভূমি প্রশাসন দুর্নীতির দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

[৯] প্রপার্টি রাইটস এলায়েন্স "ইন্টারন্যাশনাল প্রপার্টি রাইটস ইনডেক্স," ২০১১,
http://www.internationalpropertyrightsindex.org/userfiles/file/ATR_2011%20INDEX_Web2.pdf (দেখা হয়েছে ১৯শে জানুয়ারি ২০১১), পৃ. ৬৬।

জমির মালিকানার ক্ষেত্রে নারী যে পিছিয়ে আছে তার জন্য অংশত দায়ী বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইন। মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি নির্ধারিত হয় ঐ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী।[১০] সাধারণ হিসাবে মুসলমান পুরুষ যে সম্পত্তি পায় তাদের নারী পড়া পায় তার অর্ধেক।[১১] হিন্দু নারীরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ কেবল ভোগদখল করতে পারে কিন্তু তা কাউকে দিতে পারে না।[১২] যেসব হিন্দু নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারবে না বলে বিশ্বাস করা হয় তারা উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো সম্পদই পায় না।[১৩] খ্রিস্টান পারিবারিক আইনে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ওপর নারীর অধিকার পুরুষের প্রায় সমান বলে স্বীকার করা হয়েছে তবে বাস্তবে খ্রিস্টান নারীরা সব সময় তাদের পুরুষ পড়োর সমান সম্পত্তি পায় না।[১৪]

নারীর উত্তরাধিকার সীমিত হওয়া সত্ত্বেও সেই অধিকারও যাতে তারা ত্যাগ করে সেজন্য তাদের ওপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিছু কিছু পরিবারে কন্যা সন্তান ভবিষ্যতে যতটুকু সম্পত্তি পাবে তা তার স্বামীর পরিবারকে যৌতুক দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। ফলে পরবর্তীকালে কন্যা সন্তানটিকে আর সম্পত্তি দেওয়া হয় না।[১৫] অনেক নারী আবার পিতৃগৃহে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি ভাইদের দিয়ে দেন এই আশায় যে বিয়ে ভাঙলে বা সংসারে দুর্যোগ দেখা দিলে ভাইদের কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে।[১৬]

---

[১০] বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা ও পারিবারিক আইনের ওপর আরো জানতে নিচে "বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ ও পৃথক বসবাস" শীর্ষক অধ্যায় দেখুন।

[১১] ড. ফস্টিনা পেরেরা, *দ্য ফ্র্যাকচার্ড স্কেলস: দ্য সার্চ ফর আ ইউনিফর্ম সিভিল কোড* (ঢাকা: স্ত্রী, ২০০২), পৃ. ৩৬। একজন মুসলমান বিধবা তাঁর স্বামীর সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ অথবা চার ভাগের এক ভাগ পেতে পারেন যা নির্ভর করে যথাক্রমে তাঁর সন্তানাদি আছে কিনা বা ছেলের ঘরে নাতি-নাতনি আছে কিনা অথবা তিনি নিঃসন্তান কিনা তার ওপর। যদি একাধিক স্ত্রী থাকেন সেক্ষেত্রে সেই আট ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ তাঁদের সকলের মধ্যে সমান ভাগ হবে। মৃত ব্যক্তির পুত্র যা পায় কন্যা পায় তার অর্ধেক।

[১২] পূর্বোক্ত, পৃ.৪৪-৪৬।

[১৩] পূর্বোক্ত। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কন্যার গুরুত্ব পঞ্চম স্থানে: সে বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তখনই হয় যখন বাবার কোনো পুত্র সন্তান থাকে না অথবা পুত্রের দিক থেকে নাতি, পুত্রের দিক থেকে নাতির ছেলে অথবা বাবার স্ত্রী থাকে না। বাবার সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে কন্যার গুরুত্ব আবার নির্ভর করে তাদের ছেলে সন্তান জন্ম দেওয়ার সামর্থ্য আছে কিনা তার ওপর। যে অবিবাহিত কন্যার ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে বিয়ে হলে সে পুত্রের জন্ম দিতে পারবে সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিবাহিত কন্যার চেয়ে তার অগ্রাধিকার বেশি। সন্তানহীন কন্যা, বিধবা কন্যা এবং একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে এমন কন্যা বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না।

[১৪] পূর্বোক্ত, পৃ.৫১-৫২।খ্রিস্টানদের উত্তরাধিকার আইন জানতে দেখুন উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫, অনুচ্ছেদ ৩৩ ও ৩৪। একজন খ্রিস্টান বিধবা স্বামীর সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ, অর্ধেক অথবা পুরোটাই পাবেন যা নির্ভর করবে যথাক্রমে স্বামীর সন্তানাদি আছে কিনা, কোনো সন্তান নেই কিন্তু ভাইবোন, কাজিন ইত্যাদি আছে অথবা স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই। ভাইবোন হিসাবে খ্রিস্টানরা সম্পত্তির সমান ভাগ পান।

[১৫] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং বাংলাদেশ লিগাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট-এর প্যানেল আইনজীবীদের মধ্যে আলোচনা, ঢাকা, ২রা এপ্রিল ২০১১; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শাহনাজ হুদার সাক্ষাৎকার, ৩০শে মার্চ ২০১১। যৌতুকের ওপর আরো তথ্য পেতে এ প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে "স্বামীগৃহে নারীর অবদান" শীর্ষক অংশটি দেখুন।

[১৬] পূর্বোক্ত।

বিয়ে এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব

> আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমি এতই ছোট যে বিয়ের অর্থই বুঝতাম না...
> আমি কাজ করে যদি কোনো পয়সা পাইও বাড়ি ফিরে তা স্বামীর হাতে তুলে দেই।
> যদি না দেই তবে সে আমাকে মারে... আমাদের এটা সহ্য করেই বাঁচতে হয়।
> আমি চলে আসতে পারি, আলাদা থাকার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু সেটা হবে
> অত্যন্ত কঠিন।
> – সালোনি (ছদ্মনাম), হিন্দু, নোয়াখালি জেলা, ২২ মে ২০১১।

বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীর বিয়ে হয় খুব কম বয়সে: দেশের আইন অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর।[১৭] সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশের ১০ বছরের বেশি বয়সী নারীর ৫৫ শতাংশের বেশি বিবাহিত।[১৮] ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী ২০ লাখেরও বেশি নারী এবং ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী আড়াই লাখ নারী বিবাহিত।[১৯]

বহু নারী ও বালিকার জন্য বিয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু বিয়ে আবার অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিও বয়ে আনতে পারে যখন বিয়ের পর মেয়েদের ওপর উপার্জনমূলক কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরের কাজ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে বিবাহিত নারীর আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চয় দু'টোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিবাহিত নারী পরিবারের গার্হস্থ্য সম্পদসহ ব্যবসা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পদ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুইভাবেই ভূমিকা রাখে। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখব যদি কোনো কারণে বিয়ে ভেঙে যায় তবে অর্জিত সেসব সম্পদের ওপর নারীর অধিকার ও দখল প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব।

নারীর আয়মূলক কাজ এবং উপার্জন ও সঞ্চয়ের ওপর বিয়ের প্রভাব

বিয়ে এবং এর সঙ্গে যে সামাজিক প্রত্যাশা জড়িয়ে থাকে তা দেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিবাহিত নারী পুরুষের চেয়ে সাংসারিক কাজে বেশি সময় ব্যয় করে। যাদের সন্তান আছে সেসব ক্ষেত্রে মা-ই বাচ্চাদের দেখভালের সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করে। এসব দায়িত্ব পালন

---

[১৭] বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯, অনুচ্ছেদ ২(ক)। পুরুষের জন্য বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ২১ বছর।

[১৮] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, "পপুলেশ টেন ইয়ারস এন্ড ওভার বাই এজ গ্রুপ, সেক্স এন্ড ম্যারিটাল স্ট্যাটাস," *স্ট্যাটিসটিকাল ইয়ারবুক অফ বাংলাদেশ* (ঢাকা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১০), সারণী ২.১০, http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/SY2010/Chapter-02.pdf (দেখা হয়েছে ১৫ই জুন ২০১১), পৃ. ৪৫। এ উৎস অনুযায়ী দেশের দশ বছর বয়সের উর্ধ্বে নারীর সংখ্যা ৪,৪৬,৪২,০৬৮ যার মধ্যে ২,৮১,০২,৬০২ জন নারী বিবাহিত (২০০১ সালের আদমশুমারিতে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে)। এছাড়া দেখুন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *রিপোর্ট অফ ওয়েলফেয়ার মনিটরিং সার্ভে ২০০৯*, http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Latest%20Statistics%20Release/welfaresurvey_09.pdf (দেখা হয়েছে ১৫ই ডিসেম্বর ২০১১), পৃ. ২।

[১৯] জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) ও অন্যান্য, "বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে, ২০০৭," ২০০৯, http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR207/FR207[April-10-2009].pdf (দেখা হয়েছে ১৫ই জুন ২০১১), পৃ. ৫৪। এ জরিপ চলাকালীন ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে প্রথম সন্তান ধারণের গড় বয়স ছিল ১৯।

করতে হয় বলে আয়মূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণের সামর্থ্য কমে যায়। যেসব নারী কম বয়সে বিয়ে করে এবং পড়ালেখা মাঝপথে বন্ধ করে দেয় কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি বাধার সম্মুখীন হয়।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন জানাচ্ছে, "কম বয়সে বিয়ে করার জন্য নারীর ওপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা হয় যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তার পড়ালেখা, আয়ের সুযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার ওপর এবং সে কম বয়সে সন্তান ধারণে বাধ্য হয়।"[২০] ২০০৬ সালের একটি জরিপে দেখা যায় উত্তরদাতা স্বামীদের ৬০ শতাংশ জানিয়েছেন তাঁদের স্ত্রীদের কোনো নিজস্ব আয়ের উৎস নেই। উত্তরদাতা স্ত্রীদের চার ভাগের তিন ভাগেরও বেশি জানিয়েছেন তাঁদের নিজস্ব কোনো আয়মূলক কাজ নেই।[২১]

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কিছু নারী জানিয়েছেন বিয়ের পর স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়-স্বজন তাঁদের আয়মূলক কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছেন। রম্নমানা আর. বিয়ের পর সোয়েটার ফ্যাক্টরির কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং অন্য জায়গায় চলে যান। তাঁর স্বামী, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন তিনি কাজ করেন তা চাননি। রম্নমানা বলেন, "আমার আগের জীবনই ভাল ছিল। যা খেতে ইচ্ছা করত খেতাম, নিজের জন্য জিনিস কিনতে পারতাম। বিয়ের পর আমি খালি বাসাতেই কাজ করতে পারি।"[২২] একইভাবে নূরজাহান এন.ও বিয়ের পর স্বামীর চাপে তাঁর কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।[২৩] একই ব্যাপার ঘটে রবিনা আর.-এর ক্ষেত্রেও যিনি বিয়ের পর বেসরকারি সংস্থায় তাঁর কাজটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন কেননা স্বামী চাননি তিনি বাইরে কাজ করম্নন। তাঁর আশা ছিল কাজ করে উপার্জন করবেন কিন্তু তার বদলে তাঁকে কেবল বাসার জন্য রান্না, কাপড় ধোয়া, বাড়ি পরিষ্কার আর পানি টানার কাজ করতে হচ্ছে।[২৪]

যেসব নারী বিয়ের পর আয়ের জন্য কাজ করেন তাঁদের অনেকে আবার টাকা না-ও পেতে পারেন। ২০০৭ সালে সম্পন্ন বাংলাদেশ জনবিন্যাস ও স্বাস্থ্য জরিপ (সাম্প্রতিকতম জরিপ যার পুরো ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে) অনুযায়ী জরিপের আওতায় পড়েছেন এমন ১৪ শতাংশ নারী তাঁদের জানিয়েছেন

---

[২০] বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, "ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-২০১৫)," প্রথম অংশ, http://www.plancomm.gov.bd/SFYP-PDF-Final%2029-08-2011/SFYP-Final-%20Part-1-17-08-11[1].pdf (দেখা হয়েছে ১৮ই ডিসেম্বর ২০১১), পৃ. ১৬৮।

[২১] মার্ক পিট ও অন্যান্য, "এমপাওয়ারিং উইমেন উইথ মাইক্রো ফিনান্স: এভিডেন্স ফ্রম বাংলাদেশ," *ইকোনমিক ডেভেলাপমেন্ট এন্ড কালচারাল চেঞ্জ*, ৫৪তম খ-, ৪ নং (২০০৪), http://repository.library.brown.edu:8080/fedora/objects/bdr:5946/datastreams/PDF/content (দেখা হয়েছে ১১ই নভেম্বর ২০১১), পৃ. ৭৯৭।

[২২] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে রম্নমানা আর. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় গাজীপুরে, ৪ই জুন ২০১১। রম্নমানা মুসলমান।

[২৩] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে নূরজাহান এন. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ঢাকায়, ৪ই অক্টোবর ২০১১। নূরজাহান মুসলমান। হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আরো যেসব নারী তাঁরাও প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী লিসা এল.(ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার যা ঢাকায় ৩রা অক্টোবর ২০১১ তারিখে নেওয়া হয়েছিল; এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের রবিনা আর. (ছদ্মনাম) সাক্ষাৎকার যা গাজীপুরে ৪ই জুন ২০১১ তারিখে নেওয়া হয়।

[২৪] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে রবিনা আর. (ছদ্মনাম) সাক্ষাৎকার যা গাজীপুরে ৪ই জুন ২০১১ তারিখে নেওয়া হয়।

তাঁরা কাজের জন্য কোনো মজুরি পান না এবং অন্য ৪ শতাংশ বলেছেন কাজের বিনিময়ে তাঁরা টাকা পান না, কেবল জিনিস পান।[২৫]

বিয়ের ফলে মেয়েদের নিজেদের আয় ও সঞ্চয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ কমে যেতে পারে। ২০০৭ সালে সম্পন্ন বাংলাদেশ জনবিন্যাস ও স্বাস্থ্য জরিপের আওতায় উত্তরদাতা ১২ শতাংশ বিবাহিত নারী জানিয়েছেন তাঁদের স্বামীরা ঠিক করেন কীভাবে স্ত্রীদের উপার্জন ব্যয় হবে, ৫৬ শতাংশ স্বামীর সঙ্গে মিলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন এবং ৩১ শতাংশ নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।[২৬] তবে ২০০৬ সালে পরিচালিত একটি বেসরকারি জরিপে দেখা গেছে উত্তরদাতা ৭৮ শতাংশ নারী জানিয়েছেন স্বামীর সঙ্গে আলোচনা ছাড়া নিজেদের আয় কোথায় ব্যবহার হবে তা ঠিক করতে পারেন না।[২৭]

নারীর নিজের আয়ের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পারিবারিক সম্পদ বাড়ার সঙ্গে। ২০০৭ সালে সম্পন্ন বাংলাদেশ জনবিন্যাস ও স্বাস্থ্য জরিপ অনুযায়ী উত্তরদাতা ৪২ শতাংশ নারী যাঁদের মাধ্যমিক বা তার বেশি শিক্ষা রয়েছে জানিয়েছেন নিজস্ব আয় কীভাবে ব্যবহার হবে সে সিদ্ধান্ত তাঁরা নিজেরা নেন। এর বিপরীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন নারী উত্তরদাতাদের ২৬ শতাংশ নিজেদের সিদ্ধান্তমতো নিজস্ব আয় ব্যবহার করতে পারেন এমনটা বলেছেন। একইভাবে জনসংখ্যাকে আর্থিক অবস্থার বিচারে পাঁচ ভাগে ভাগ করলে সবচেয়ে সচ্ছল বা অর্থশালী অংশের নারীদের নিজস্ব আয় ব্যবহারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সবচেয়ে নিচে থাকা এক-পঞ্চমাংশে যে নারীরা রয়েছেন তাঁদের চেয়ে বেশি।[২৮]

বিয়ের ফলে নিজস্ব সঞ্চয়ের ওপরও নারীর নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। ২০০৬ সালে পরিচালিত এক জরিপ থেকে দেখা যায় যেসব নারী তাঁদের নিজস্ব সঞ্চয় রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৯০ শতাংশ বলেছেন স্বামীরা তাঁদের সঞ্চয় বিষয়ে অবগত এবং ৮৫ শতাংশ বলেছেন নিজেদের সঞ্চয়ের ওপর তাঁদের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ নেই।[২৯]

---

[২৫] নিপোর্ট ও অন্যান্য, "বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে, ২০০৭," ২০০৯, http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR207/FR207[April-10-2009].pdf (দেখা হয়েছে ১৫, ২০১১), পৃ. ১৮১-২। সাম্প্রতিককালে আরো ডিএইচএস জরিপ হয়েছে তবে তার কেবল প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে ২০১১ সালে।

[২৬] পূর্বোক্ত, পৃ.১৮২।

[২৭] পিট ও অন্যান্য, "এমপাওয়ারিং উইমেন," পৃ. ৭৯৭।

[২৮] বাংলাদেশ জনবিন্যাস ও স্বাস্থ্য জরিপ, ২০০৭, পৃ.১৮৬-৭।

[২৯] পিট ও অন্যান্য, "এমপাওয়ারিং উইমেন," পৃ. ৭৯৭।

বৈবাহিক বাড়িতে (স্বামীগৃহে) নারীর অবদান

> তিনি বলতেন, "আমি মা দূর্গার মতো। আমার দশটা হাত। আমি বাড়িতে কতটা শ্রম দেই কেউ তার মূল্যায়ন করে না। বাসার সকলের জন্য আমি রান্না করি কিন্তু নিজে খাই সবার শেষে।"
>
> – মাকসুদা আখতার, আইনজীবী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ৪ অক্টোবর ২০১১। তাঁর এক মক্কেল তাঁকে এ কথা বলেছিলেন।

স্বামীগৃহে যাওয়ার পর নারী নানাভাবে অবদান রাখতে শুরম্ন করে। বাড়ি, পারিবারিক ব্যবসা ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বাড়ানোর মাধ্যমে পারিবারিক সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধিতে শ্রম দেন। বিবাহিত পুরম্নষও তাই করে কিন্তু অর্জিত সে সম্পদের ওপর পুরম্নষের যে নিয়ন্ত্রণ থাকে তার কিছুই প্রায় নারীর থাকে না। কোনো কারণে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটলে নারী তার এতদিনের শ্রমের কোনো সুফল ভোগ করতে পারে না কেননা সে সম্পদের প্রায় কিছুই তার কাছে আসে না।

অর্থ-বহির্ভূত অবদান

বাংলাদেশে বিবাহিত নারী পারিবারিক সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধিতে অনেক অবদান রাখেন যা ঐ সম্পদের মূল্য বাড়ায়। নারীর এ শ্রম পরিবার টিঁকিয়ে রাখার জন্য অত্যাবশ্যক কিন্তু এ অবদান তারা আর্থিক বা সম্পদের আকারে রাখে না। অর্থনৈতিক বিবরণী দেন যাঁরা নারীর এ শ্রমকে "অ-অর্থনৈতিক" বলে অভিহিত করার প্রবণতা তাঁদের মধ্যে দেখা যায় যদিও এ অবদানের সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে।

বিবাহিত নারী বিবাহিত পুরম্নষের চেয়ে অনেক বেশি সময় গৃহস্থালি কাজে ব্যয় করেন। এতে করে আয়মূলক কাজে লাগার সামর্থ্য তাঁদের কমে যায়।[৩০]

২০০৭ সালের একটি জরিপে দেখা যায় উত্তরদাতা পুরম্নষদের ৫৭ শতাংশ ও নারীদের ৫৫ শতাংশ বলেছেন নারীরা সাংসারিক কাজে ১৬-২০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে।[৩১] উত্তরদাতা ৪০ শতাংশেরও বেশি নারী ও পুরম্নষ উভয়ই বলেছেন বাড়িতে পুরম্নষরা কোনো কাজই করে না।[৩২]

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যেসব বিবাহিত নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে নিজেদের গৃহস্থালি কাজের বিবরণ দিয়েছেন যার মধ্যে রয়েছে রান্না, বাড়ি পরিষ্কার, কাপড় ও বাসনকোসন ধোয়া, গরম্ন-ছাগল চরানো,

---

[৩০] ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড), "কান্ট্রি ব্রিফ: বাংলাদেশ," ২০০৮, http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/pubs/usaid_booklet_bangladesh_508.pdf (দেখা হয়েছে ২৩শে জুন ২০১১), পৃ.২।

[৩১] ডেবরা এফ্রোইমসন ও অন্যান্য, "বাংলাদেশে মজুরিবিহীন শ্রমের মাধ্যমে অর্থনীতিতে নারীর অবদান," সেপ্টেম্বর ২০০৭, http://www.healthbridge.ca/economic%20contribution%20report.pdf (দেখা হয়েছে ৬ই ডিসেম্বর ২০১১), পৃ. ১৩।

[৩২] পূর্বোক্ত ১৪।

পানি আনা এবং শিশু, প্রবীণ ও স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের দেখভাল ও পরিচর্যা। জয়া তার স্বামী থেকে আলাদা হওয়ার আগে তাঁর দৈনন্দিন কাজের বিবরণ দিয়েছেন:

> ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমার দিন শুরু হতো। ঘুম থেকে উঠে নাস্তার জন্য রুটি-ভাজি বানাতাম। সাড়ে সাতটার মধ্যে নাস্তা দিতে না পারলে আমার শাশুড়ি চীৎকার শুরু করতেন। ময়লা কাপড় ভিজাতাম, সবাইকে নাস্তা দিতাম, তারপর কাপড় ধুতাম... তারপর আমার মেয়েকে চান করিয়ে খাওয়াতাম। আমার মেয়ে চাইত আমি তার সঙ্গে খেলি কিন্তু ওদিকে আমার শাশুড়ি চীৎকার করতেন, "কী হচ্ছেটা কী? আমার খাবার রান্না করবে কে?"... আমার ভেতরটা ছিঁড়ে যেত কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে আমাকে রান্না করতে যেতে হতো, তারপর ছিল বাসন মাজা। প্রায়ই আমার চান করার সময়টাও হতো না। মেয়েকে খাওয়ানোর পর তাকে ঘুম পাড়াতাম। দুপুরে খাওয়ার পর যদি কখনও ঝিমুনি আসত শাশুড়ি আবার রেগে উঠতেন। কাজ কখনও ফুরাত না।[৩৩]

বহু নারী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন তাঁরা পারিবারিক কৃষিজমি এবং ব্যবসাতে বিনা মজুরির শ্রম দেন। মহিমা এম. বলেছেন তিনি স্বামীর সেলাইয়ের ব্যবসায় কাপড়ে ফুল তোলেন কিন্তু কোনো মজুরি পান না।[৩৪] শেফালি এস. কৃষিজমিতে কাজ করেছেন আবার সংসারেও কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি ধান, গম ও আখের বীজ বুনেছি, ফসল তুলেছি আবার ওদিকে বাড়িতেও কাপড় ধোয়া, রান্নাবাড়া, বাচ্চাকে চান করানো, খাওয়ানো সবই করতে হয়েছে।"[৩৫]

আর্থিক অবদান: সঞ্চয়, সম্পত্তি, যৌতুক

বহু নারী স্বামীগৃহে যাওয়ার পর পারিবারিক সম্পদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে অর্থকড়ি দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া এ টাকা-পয়সাও বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটলে ফেরত পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রবিনা আর.-এর যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর স্বামীর পরিবারের মাত্র একটা ঘর ছিল। রবিনা ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন নতুন দম্পতির জায়গার ওপর টিনের ঘর তোলার খরচ দেন। এতে তাঁদের খরচ হয় সাড়ে তিন লাখ টাকা (৪২৬৭ মার্কিন ডলার)। "আমি আমার সমস্ত সঞ্চয় দিয়েছি। আমার বোন ও চাচাও (বা মামা) টাকা দিয়েছেন। সবই দিয়েছেন তাঁরা – কানের দুল, চুড়ি, আংটি, আসবাব, শোকেস, স্টিলের আলমারি, ফ্যান, সোফা সবকিছু দেওয়া হয়েছে।"[৩৬]

---

[৩৩] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে নেওয়া খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী জয়া জে. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার। ঢাকা, ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১১।

[৩৪] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে নেওয়া মহিমা এম. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার। মহিমা মুসলমান। ঢাকা, ১৯শে মে ২০১১।

[৩৫] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে নেওয়া শেফালি এস. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার। শেফালি মুসলমান। ঢাকা, ১৯শে মে ২০১১। অধিকার কর্মী এবং অন্যান্য নারীও মহিলাদের স্বামীর পারিবারিক কৃষিজমিতে ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনা মজুরির শ্রম দেওয়ার অনেক ঘটনা উলেস্নখ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে দেখুন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কর্তৃক গৃহীত রুমানা আর. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার, মুসলমান, গাজীপুর, ৪ই জুন ২০১১; এইচআইভি আক্রান্তদের অধিকার আদায়ে সক্রিয় একজন ব্যক্তির (ইনি পরিচয়বিহীন থাকতে চেয়েছেন) সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৮ই মে ২০১১।

[৩৬] হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সঙ্গে রবিনা আর. (ছদ্মনাম) সাক্ষাৎকার, ৪ই জুন ২০১১। আরো দেখুন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নেওয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের নিম্মি এন. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার, গাজীপুর জেলা, ৪ই জুন ২০১১।

একইভাবে রন্নকসাদা আর.-এর বাবা তাঁকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন যা তিনি স্বামীকে দেন তাঁদের দু'জনের নামে জমি কেনার জন্য। কিন্তু স্বামী সেই টাকা দিয়ে রন্নকসাদাকে বাদ দিয়ে নিজের নামে জমি কেনেন।[৩৭]

কিছু নারী আবার বলেছেন তাঁরা স্বামীর পেশাগত উন্নতি বা ব্যবসা আগানোর জন্য তাঁদের আয়ের টাকা ও সম্পত্তি যেমন গয়না স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছেন। হাসিনা এইচ. ও তাঁর মা স্বামীকে ইতালিতে পাঠানোর জন্য সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ করেছেন। পরে স্বামী হাসিনাকে ত্যাগ করেন।[৩৮] আইনজীবী ফারহানা আফরোজ হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন কীভাবে তাঁর মক্কেল লীলা এল. তাঁর বাবার কাছ থেকে পাওয়া দুই লাখ টাকা স্বামীকে দেন ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য। স্বামী তাঁকে মারতে শুরন্ন করেন যাতে লীলা ব্যবসায়ে কোনো অংশীদারিত্ব দাবি না করে তাঁকে ছেড়ে চলে যান।[৩৯] পারিবারিক আদালতের প্রাক্তন এক বিচারক বর্ণনা করেছেন আরেকটি ঘটনা যেখানে মেয়েটি ও তাঁর বাবা তাঁদের সমস্ত্ম সঞ্চয় খরচ করে মেয়েটির স্বামীকে মেডিকেল কলেজের শিক্ষা শেষ করতে সাহায্য করেন যে স্বামী পরে মেয়েটিকে তালাক দেন। মেয়েটি ও তাঁর বাবার কোনো সঞ্চয়ই আর অবশিষ্ট ছিল না।[৪০]

যৌতুকের মাধ্যমে স্বামীর পারিবারিক সম্পদ বৃদ্ধি মেয়েটির দিক থেকে আরেকটি প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক অবদান। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কনে বা তার পরিবার স্বামী বা তার পরিবারকে বিয়ের সময় বা কখনও তার পরে যৌতুক হিসাবে অর্থ বা অন্যান্য সম্পদ দিয়ে থাকে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যৌতুক গ্রহণকে দ-নীয় অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে আইন পাশ করা হয়েছে।[৪১] তা সত্ত্বেও পি-ত এবং নারী অধিকার কর্মীদের সকলেই বলেছেন যৌতুক প্রথা বাংলাদেশে অত্যন্ত্ম ব্যাপ্ত।[৪২] অন্ত্মত একটি গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের সমাজে যৌতুক প্রথার বিস্ত্মার ঘটছে।[৪৩]

---

[৩৭] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে নেওয়া রন্নকসাদা (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার। রন্নকসাদা মুসলমান। ঢাকা, ২৭শে মে ২০১১।

[৩৮] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে নেওয়া হাসিনা (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার। হাসিনা মুসলমান। ঢাকা, ২৮শে মে ২০১১।

[৩৯] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কর্তৃক গৃহীত আইন ও সালিশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানের মামলা বিভাগের উর্ধ্বতন আইন কর্মকর্তা ফারহানা আফরোজের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৩১শে মে ২০১১।

[৪০] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কর্তৃক গৃহীত পারিবারিক আদালতের একজন প্রাক্তন বিচারকের সাক্ষাৎকার। ইনি দেশের ১০টি জেলায় এক হাজার মামলার বিচারিক দায়িত্ব পালন করেছেন (নাম ও অন্যান্য তথ্য তাঁর অনুরোধে উহ্য রাখা হলো।)

[৪১] যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, এ আইনের ৩ ও ৪ অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী যৌতুক গ্রহণ বা যৌতুক গ্রহণে সহায়তার জন্য সর্বনিম্ন এক বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত্ম কারাদ- হতে পারে বা জরিমানা হতে পারে অথবা জেল-জরিমানা দুই-ই হতে পারে। অনুচ্ছেদ ৪ যৌতুক দাবিকে দ-যোগ্য অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে একই শাস্ত্মির বিধান দিয়েছে।

[৪২] যৌতুক গ্রহণ দ-নীয় অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও কেন বিস্ত্মৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে পি-ত ও নারী অধিকার কর্মীরা বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়ে থাকেন। প্রথমত, কনের পরিবার তালাকা বা স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিরন্দ্ধে এক ধরনের রক্ষাকবচ হিসাবে যৌতুককে দেখে থাকে। দ্বিতীয়ত, কনের পরিবারের পক্ষ থেকে যৌতুককে বাবা-মার মৃত্যু-পূর্ব উত্তরাধিকার হিসাবে দেখা হয়। অথবা পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী ব্যবহারের কারণে নারীর সন্ত্মানধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেখা হয় একে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শাহনাজ হুদার সাক্ষাৎকার, ৩০শে মার্চ ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কর্তৃক বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়েশা খানম ও আইন বিভাগের প্রধান মাকসুদা আখতারের সাক্ষাৎকার, ২৯শে মার্চ ২০১১। আরো দেখুন বারতা এস্ত্মে ভোলার্ট, "ডাউরি ইন রন্নরাল বাংলাদেশ: পার্টিসিপেশন এজ ইনসিওরেন্স এগেনস্ট ডিভোর্স," এপ্রিল ২০০৪, http://www.cepr.org/meets/wkcn/3/3520/papers/esteve_volart.pdf (দেখা হয়েছে ৩রা নভেম্বর ২০১১); লুসিয়ানা সুরান ও অন্যান্য, "ডাজ ডাউরি ইমপ্রন্নভ লাইফ ফর ব্রাইডস? আ টেস্ট অফ দ্য বিকোয়েস্ট থিয়োরি অফ ডাউরি ইন রন্নরাল বাংলাদেশ," পপুলেশন কাউন্সিল ওয়ার্কিং পেপার নম্বর ১৯৪, ২০০৪, http://www.popcouncil.org/pdfs/wp/195.pdf (দেখা হয়েছে ১৫ই নভেম্বর ২০১১); এরিকা ও

প্রায় সব বিবাহিত নারী যাঁরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন জানিয়েছেন তাঁরা বিয়েতে যৌতুক দিয়েছেন।[৪৪] এঁদের মধ্যে কারো কারো কাছে স্বামী বা তাঁর পরিবার বার বার যৌতুক দাবি করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা সহিংস নির্যাতনের রূপ নিয়েছে। উদাহরণ হিসাবে আসমা এ.-এর কথা বলা যায় যিনি স্বামীগৃহ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন যখন আরো যৌতুকের দাবি পূরণ করতে না পারায় স্বামী তাঁকে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছিলেন। আসমার কথায়,

> সে [আসমার স্বামী] তার ব্যবসায় উন্নতি করতে চাচ্ছিল... [তার] কোনো ট্রেড লাইসেন্স ছিল না যেটা করার জন্য তারা টাকার দরকার হয়েছিল। সে আগেই আমার সব সোনার গয়না নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছিল। আমি যখন টাকা দিতে পারি না তখন সে দরজা বন্ধ করে আমাকে লাথি মারে, গলা টিপে ধরে আর মারতে থাকে যতক্ষণ না আমার হাত জখম হয়। এখন সে আমাকে হুমকি দেয় যে আমাকে পুড়িয়ে মারবে যদিও আমি এখন গর্ভবতী। সে বলে আমার বাবা-মা যদি তাকে টাকা না দেয় তাহলে আমাকে বেশ্যাবৃত্তি করে তাকে টাকা এনে দিতে হবে। নয়ত [সে] আমাকে ছেড়ে দেবে বলে হুমকি দেয়। সে বলে সে এখন সহজেই আরেকটা বিয়ে করে দুই লাখ টাকা যৌতুক আনতে পারে।[৪৫]

শাহনাজ এস.-এর স্বামীও তাঁকে যৌতুকের জন্য নির্যাতন করেছিলেন। "বিয়ের সময় আমি ও আমার মা মিলে ৪০ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। তিন মাস পর সে আরো ৩৫ হাজার টাকা দাবি করে। আমার মা তার সোনার গয়না বন্ধক রেখে ও ধার করে সেই টাকা আমার স্বামীকে দেন। সে এই টাকা দাবি করেছিল তার মুদি দোকানের আরো উন্নতি করার জন্য।[৪৬]

অন্যান্য, "মুসলিম ফ্যামিলি ল, প্রিনুপটিয়াল এগ্রিমেন্টস এন্ড দ্য ইমার্জেন্স অফ ডাউরি ইন বাংলাদেশ," ২০০৮, http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Intellectual_Life/FieldAmbrusTorero_February08_(2).pdf (দেখা হয়েছে ১৫ই নভেম্বর ২০১১); এবং রাজ অরন্নণাচলম ও সুরেশ নাইডু, "দ্য প্রাইস অফ ফার্টিলিটি: ম্যারেজ মার্কেটস এন্ড দ্য প্রাইস অফ ফার্টিলিটি ইন বাংলাদেশ," ২০০৮, http://www-personal.umich.edu/~arunacha/AN_dowryfertility.pdf (দেখা হয়েছে ১৫ই নভেম্বর ২০১১)।

[৪৩] বারতা এস্তেম্ব ভোলার্ট, "ডাউরি ইন রন্নরাল বাংলাদেশ," পৃ. ১৯ (বলা হয়েছে মুসলমান সমাজে যৌতুকের বিস্তার ঘটছে)।

[৪৪] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কর্তৃক গৃহীত বিবাহিত নারী ও আইনজীবীদের সাক্ষাৎকার। এসব সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে ঢাকা শহর, নোয়াখালি, গাজীপুর ও মাদারিপুর জেলায়, মে, জুন, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০১১। গুটিকয়েক বিবাহিত নারী জানিয়েছেন তাঁরা যৌতুক দেননি। বাকি সব মহিলা বলেছেন তাঁদের যৌতুক দিতে হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সঙ্গে সারা এস. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকারের কথা। মুসলমান এই নারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল নোয়াখালিতে, ২০শে মে ২০১১।

[৪৫] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে নেওয়া আসমা এ. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার। আসমা মুসলমান। ঢাকা, ২৪শে মে ২০১১।

[৪৬] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কর্তৃক গৃহীত ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাহনাজ এস. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার। ঢাকা, ২রা জুন ২০১১।

ৈবাহিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ

স্বামীগৃহের সম্পদ ব্যবস্থা ও তার শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্ত্রীর অবদান থাকা সত্ত্বেও সেসব সম্পদ, স্থাবর-অস্থাবর সব ধরনের সম্পত্তির মালিক ও নিয়ন্ত্রণের কর্তা কেবল স্বামী। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত লিঙ্গ মূল্যবোধ জরিপ অনুযায়ী জরিপের আওতাধীন ১০ শতাংশেরও কম ক্ষেত্রে স্বামীগৃহের সম্পদে স্ত্রীদের নাম ছিল। আবার কম বয়সীদের (১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী) ক্ষেত্রে তিন শতাংশেরও কম স্ত্রীদের নাম স্বামীগৃহের সম্পদের মধ্যে ছিল। এক্ষেত্রে ভাড়া করা ও মালিকানা উভয় প্রকার সম্পদই গণ্য হয়েছে।[৪৭] এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক ২০০০ সালে পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফলও উলেস্নখযোগ্য। বাংলাদেশের তিন জেলায় ৪৭টি গ্রামে পরিচালিত এ খানা জরিপ অনুযায়ী " বর্তমানে এবং বিয়েকালীন উভয় ক্ষেত্রেই স্বামীরা প্রায় রীতিমাফিক স্ত্রীদের চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক।"[৪৮] এবং "স্ত্রীর বর্তমান সম্পদের গড় মূল্য পরিবারের মোট সম্পদের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ।"[৪৯] স্ত্রীদের মধ্যে ৭০ শতাংশ গয়নার মালিক এবং মাত্র ১৫ শতাংশ পারিবারিক স্থাবর সম্পদের মালিক।[৫০]

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যেসব নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে সেখানে স্বামীগৃহের সম্পদের ওপর স্ত্রীদের মালিকানার অনুপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণের অভাবের বিষয়টি বারবার ফিরে এসেছে। উদাহরণ হিসাবে সালোনি এস.-এর কথা বলা যায়। তিনি বলেছেন, "আমরা বাড়ি তৈরির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি। আমার কানের দুল বিক্রি করেছি, বাইরে কাজ করে আয় করেছি, মাঠে চাষ করেছি, গরম্ন চরিয়েছি। পয়সা যা পেয়েছি সব স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু সবকিছুর পরে বাড়ি আমার স্বামীর নামে।"[৫১]

নীরা একটা মুরগির ফার্মে কাজ করে যা পেতেন সব স্বামীকে দিতেন। স্বামী জমি কেনেন তবে সেটা শুধু নিজের নামে। "টাকা জমানোর জন্য মুখে রক্ত তুলে দিনের পর দিন খেটেছি। কিন্তু সেই সঞ্চয়ের এখন কী আছে আমার কাছে? কিচ্ছু না," নীরা বলেছিলেন।[৫২]

---

[৪৭] বিশ্ব ব্যাংক, "হুইসপার টু ভয়েসেস: জেন্ডার এন্ড সোশ্যাল ট্র্যান্সফরমেশন ইন বাংলাদেশ," বাংলাদেশ ডেভেলাপমেন্ট সিরিজ, পেপার নং ২২, ২০০৮, http://siteresources.worldbank.org/INTBANGLADESH/Resources/295657-205740286726/genderReport.pdf (দেখা হয়েছে ৩রা নভেম্বর ২০১১), পৃ. ৭৬, প্যারা ৫.১১।

[৪৮] এগনেস কুইসামবিং এবং বেনেডিক্টে ডি লা ব্রিয়ের, "উইমেনস অ্যাসেটস এন্ড ইন্ট্রাহাউজ অ্যালোকেশন ইন রম্নরাল বাংলাদেশ: টেস্টিং মেজারস অফ বার্গেনিং পাওয়ার," ডিসকাশন পেপার নম্বর ৮৬, ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ২০০০, http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/fcnbr86.pdf (দেখা হয়েছে ৩রা নভেম্বর ২০১১), পৃষ্ঠানম্বরবিহীন।

[৪৯] ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট, "মাদার-ফাদার রিসোর্সেস এন্ড গার্ল-বয় হেলথ ইন রম্নরাল বাংলাদেশ," এপ্রিল ২০০০, পলিসি ব্রিফ নম্বর ৩, *জেন্ডার এন্ড হাউজহোল্ড অ্যাসপেক্টস অফ ফুড পলিসি*, http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/mp17_briefo3.pdf (দেখা হয়েছে ৩রা নভেম্বর ২০১১), পৃষ্ঠানম্বরবিহীন।

[৫০] এগনেস কুইসামবিং এবং বেনেডিক্টে ডি লা ব্রিয়ের, "উইমেনস অ্যাসেটস এন্ড ইন্ট্রাহাউজ অ্যালোকেশন ইন রম্নরাল বাংলাদেশ," পৃষ্ঠানম্বরবিহীন।

[৫১] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কর্তৃক গৃহীত সালোনি এস. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার। সালোনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় নোয়াখালিতে, ২২শে মে ২০১১।

[৫২] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কর্তৃক গৃহীত নীরা এন. (ছদ্মনাম)-এর সাক্ষাৎকার। নীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের। সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় নোয়াখালিতে, ২২শে মে ২০১১।

২. বিবাহ, তালাক ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন

বাংলাদেশ নারী অধিকারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে (যেমন পারিবারিক নির্যাতন) অনেক শক্ত আইন করেছে। কিন্তু পারিবারিক বিষয় যেমন বিবাহ তালাক ও বিচ্ছেদ আইনগুলি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত এবং বৈষম্যমূলক। বিবাহ বা বিবাহ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রায় সকল বিষয়েই বাংলাদেশে লিখিত বা অলিখিত ব্যক্তিগত ধর্মীয় আইনগুলির উপরে নির্ভর করা হয়। এ ব্যক্তিগত ধর্মীয় আইনগুলি নারীদের প্রতি অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। সংবিধানে বলা হয়েছে "রাষ্ট্র লিঙ্গভেদে বা অন্য কোন কারণে কোন প্রকার বৈষম্য প্রর্দশন করবে না এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে"।[৫৩] কিন্তু সংবিধানে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সমঅধিকারের বিষয়টি সরাসরি উলেস্নখ করা হয়নি। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে নারী ও কিশোরীদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশে অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এগুলি সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। এর মধ্যে বিশেষভাবে উলেস্নখযোগ্য হল ২০১০ সালের পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, বহু বছর ধরে বিদ্যমান রয়েছে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং এসিড অপরাধ দমন আইন।[৫৪] বাংলাদেশে এখন যে আইনটা অত্যন্ত জরুরীভাবে প্রণয়ন করা দরকার সেটা হল বিবাহ ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে নারী পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ আইন। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে বিদ্যমান পারিবারিক আইনসমূহ এবং সেগুলি কিভাবে বিবাহ, তালাক, বিচ্ছেদ এবং ভরণপোষণের (যদি থাকে) বিষয়গুলি পরিচালনা করে তা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও আলোচনা করা হয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে বিবাহত্তোর সম্পত্তি বন্টনের আইন এর অনুপস্থিতির কথা। সবশেষে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটি হলো একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন যা সকল ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য হবে এবং বিদ্যমান পারিবারিক আইনের পর্যায়ক্রমিক সংস্কার করবে। এই আইনটি প্রণয়নের অতীত ও বর্তমান প্রচেষ্টা এবং প্রস্তাবনাসমূহও আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পারিবারিক আইন

বাংলাদেশে বিবাহ, তালাক, পৃথকবাস এবং বিচ্ছেদ পরবর্তী অর্থনৈতিক অধিকার সবকিছুই প্রায় সম্পূর্নভাবে ব্যক্তিগত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।[৫৫] ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮৯.৭% জনগোষ্ঠী মুসলিম), হিন্দু শতকরা ৯.২ ভাগ, বৌদ্ধ ০.৭ ভাগ এবং খ্রীস্টান ০.৩ ভাগ।[৫৬] তবে যে সকল জনগণ নিজেদেরকে কোন নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী মনে করেন না তাদের কোন

---

[৫৩] পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ ২৮(১) "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষ বা সন্তানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না, (২) রাষ্ট্র ও গনজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।"

[৫৪] পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩), যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এবং এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২, বাংলাদেশে আরো রয়েছে ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, ১৯২৯।

[৫৫] বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

[৫৬] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর "বাংলাদেশ আদমশুমারী ২০০১" ২০০৪, বিস্তারিত দেখুন Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, "Bangladesh: Country Profile," http://www.banbeis.gov.bd/bd_pro.htm (accessed November 22,

পরিসংখ্যান নাই। বাংলদেশে ব্যক্তিগত আইনগুলি সংকলিত ও অসংকলিত আইনের একটি সংমিশ্রণ। সংকলনগুলি বেশিরভাগই করা হয়েছে বৃটিশ আমলে, কিছু কিছু ১৯ শতকের ব্যক্তিগত আইনও আছে।[৫৭] ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের সকল আইনই গ্রহণ করেছে।[৫৮] এই সংকলিত ও অসংকলিত আইনসমুহ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে এবং এ ধরনের আইনী সিদ্ধান্তগুলি এখন আইনের উৎস হিসেবে পরিচিত। ব্যক্তিগত আইনের পাশাপাশি কিছু দেওয়ানী আইন রয়েছে যা বিবাহ বা বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সকলের প্রতি প্রযোজ্য হয়। যেমন বিশেষ বিবাহ আইন ১৮৭২, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৯৯০।[৫৯] বিশেষ বিবাহ আইনের ভূমিকাতে বলা হয়েছে যে, এটি তাদের প্রতি প্রযোজ্য হবে যারা কোন নির্দিষ্ট ধর্ম পালন করেন না বা সেই ধরনের ধর্মীয় গোষ্ঠী যাদের বিবাহের আইনগত বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন আছে।[৬০] পারিবারিক আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বিশেষ বিবাহ আইনটি খুবই কম ব্যবহৃত হয় এবং বাস্তবে যেটা হয় তা হল বিবাহের পাত্র-পাত্রীদে এই আইনের অধীনে বিয়ে করতে হলে একটা ঘোষণাপত্রে সই করতে হয় যে তারা কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না, যার ফলে এটা ব্যবহার করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।[৬১] বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৮৬৯ মূলত: করা হয়েছিল খ্রীস্টানদের জন্য যা পরবর্তীতে বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে সম্পন্ন বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়।[৬২]

2011). হিন্দু সম্প্রদায় এই গণনার প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলেন বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আরো অনেকবেশী। আইনজীবী ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা সুব্রত চৌধুরীর সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার , ৩রা অক্টোবর, ২০১১।

[৫৭] বৃটিশ আমলে ব্যক্তিগত আইন সংকলনের সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সেটা কিভাবে নারীদের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ কছে তার বিস্তারিত অন্যান্য তথ্যসুত্রে রয়েছে এবং এই প্রতিবেদনের আওতা বর্হিভূত। যেমন উদাহরনস্বরুপ Janaki Nair, *Women and Law in Colonial India* (New Delhi: Kali for Women, 1996).

[৫৮] বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইন গ্রহন) আবেদন, ১৯৭২।

[৫৯] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরবর্তী "আইনী প্রতিবন্ধকতা" অধ্যায়টি দেখুন। ২০১০ সালে সংসদে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন পাশ হয়েছে। এই আইনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য "বিবাহত্তোর সম্পত্তি আইনের অভাব" এবং "বাংলাদেশের বিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত ও পৃথকবাসরত নারীদের ওপর বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইনের প্রভাব" অধ্যায় দুটি দেখুন। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ কার্যকর হবার পূর্বে সকল ধর্মের নারীরাই ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪৮৮ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারী আদালতে ভরণপোষণের দাবী নিয়ে যেতেন। কিন্তু আইনজীবীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেন, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ কার্যকর হবার পর ওই আদালতসমূহের এই ক্ষমতা আর নেই। সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসের ট্রাষ্ট্রের পরার্মশক ড. জাহিদুল ইসলামের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ইমেইল যোগাযোগ, জুন ৬, ২০১২; Zahidul Islam, *Strengthening Family Courts: An Analysis of the Confusions and Uncertainties Thwarting the Family Courts in Bangladesh* (Dhaka, BLAST: 2006), http://www.blast.org.bd/content/publications/family_courts.pdf, pp. 16-17 (accessed June 6, 2012)|

[৬০] বিশেষ বিবাহ আইনের ১৮৭২ এবং ভূমিকা "যে সকল ব্যক্তি খ্রিস্টান, ইহুদী, হিন্দু, মুসলিম, পার্সি, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন কোন ধর্মের অনুসারী নয় এবং যে সকল ব্যক্তি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুসারী এবং যাদের বিবাহের বৈধতা নিয়ে সন্দেহ রয়ে যায় সেইসকল ক্ষেত্রে বিবাহের বৈধতা দেওয়া'

[৬১] নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার- সারা হোসেন, আইনজীবী এবং অনারারী পরিচালক বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (বস্নাস্ট), ঢাকা, মার্চ ২৬, ২০১১; ড. ফস্টিনা পেরেরা, পরিচালক, ব্র্যাক হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস, ঢাকা ৩১ মে ২০১১; সুলতানা কামাল, নির্বাহী পরিচালক, আইস ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা , ১৬ মে ২০১১।

[৬২] বিশেষ বিবাহ আইন ১৮৭২, ধারা ১৭।

তালিকা : বিবাহ ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মুসলিম, হিন্দু ও খ্রীষ্টান আইনগুলির মূল উপাদনসমূহ

	মুসলিম	***হিন্দু***	***খ্রিস্টান***
বিবাহ ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মূল আইন	মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, মুসলিম বিবাহ ও বিচ্ছেদ (নিবন্ধীকরণ) আইন ১৯৭৪	বিবাহিত হিন্দু নারীর পৃথকবাস ও ভরণপোষন আইন ১৯৪৬	খ্রীস্টান বিবাহ আইন ১৮৭২, বিচ্ছেদ আইন ১৮৬৯
বিবাহ / নিবন্ধীকরণ	বিবাহের চুক্তি ও নিবন্ধীকরণ আবশ্যক	বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের কোন বিধান নাই	বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন আবশ্যক
দেনমোহর	বিবাহের চুক্তিতে দেনমোহর সুনির্দিষ্ট থাকে। দেনমোহর বিয়ের সময় সম্পুর্ণ বা আংশিক পরিশোধ হতে পারে।	হিন্দু বিয়েতে দেনমোহর বা এধরনের কিছুই নাই।	খ্রীস্টানদের জন্য দেনমোহরের কোন বিধান নাই।
যৌতুক	বেআইনী এবং ধর্ম সমর্থন করে না।	অবৈধ কিন্তু যৌতুকের দাবীকে ঐতিহাসিকভাবে ধর্মীয় রূপ দেওয়া হয়েছে। যদিও বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দেখান বাস্তবে ধর্মের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।	বেআইনী এবং ধর্ম সমর্থন করে না।
বহু বিবাহ	পুরুষ চারটি বিবাহ করতে পারে তবে পূর্ববর্তী স্ত্রীগণের অনুমতি সাপেক্ষে, সকল স্ত্রীগণকে সমমর্যাদা দিতে হবে, সালিসী পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।	পুরুষ যে কোন সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। পূর্ববর্তী স্ত্রী বা স্ত্রীগণের অনুমতি বা সমমর্যাদার কোন বিধান নাই। পদ্ধতিগত রক্ষাকবজ নাই।	বৈধ নয়।
তালাক	স্বামী: বিনা কারনে তালাক দিতে পারে, পদ্ধতিগতভাবে পরিচালিত স্ত্রী: বিনাকারনে তালাক দিতে পারে যদি কাবিননামায় স্বামী তাকে এই ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন। অন্যথায় দুজনের সম্মতিতে তালাক প্রদান করা সম্ভব (মুবারাত ও খুলা তালাক পদ্ধতি)। যদি আদালতের বাইরে কোনভাবে তালাক সম্ভব না হয় তবে স্ত্রী আদালতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তালাকের আবেদন করতে পারেন।	তালাকের কোন বিধান নাই। স্ত্রী আদালতে পৃথক বসবাস এবং ভরণপোষনের আবেদন করতে পারে।	স্বামী ও স্ত্রী সীমাবদ্ধ কিছু ক্ষেত্রে তালাকের আবেদন করতে পারেন। তবে স্ত্রীর আবেদনের ক্ষেত্রগুলি খুবই রক্ষণশীল।

	মুসলিম	*হিন্দু*	*খ্রিস্টান*
বিবাহিত অবস্থায় ভরণপোষণ	স্বামী তার স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, তবে এটা স্ত্রীর সতীত্ব ও স্বামীর প্রতি বাধ্যতার সাথে সর্ম্পকিত।	স্বামী তার স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, তবে এটা স্ত্রীর সতীত্ব ও স্বামীর প্রতি বাধ্যতার সাথে সর্ম্পকিত।	স্বামী তার স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, তবে এটা স্ত্রীর সতীত্ব ও স্বামীর প্রতি বাধ্যতার সাথে সর্ম্পকিত।
তালাক বা বিচ্ছেদ পরবর্তী ভরণপোষণ	মুসলিম তালাকপ্রাপ্ত নারীর ভরণপোষণের অধিকার নাই, তবে তালাকের নোটিশ দেবার নব্বই দিন পর্যন্ত্ম বা স্ত্রী যদি গর্ভবতী হন তাহলে সন্ত্মান জন্ম না হওয়া পর্যন্ত্ম।	তালাকের বিধান নাই। স্ত্রী কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আদালতে পৃথক বাসগৃহ এবং ভরণপোষনের আবেদন করতে পারেন। সতীত্ব ও স্বামীর অনুগত থাকার শর্ত প্রযোজ্য।	স্ত্রী তালাক পরবর্তী ভরণপোষণ দাবি করতে পারে।
বিবাহত্তোর সম্পত্তি	শুধুমাত্র পৃথক সম্পত্তি। সংসারে স্ত্রীর অবদান যাই থাকুক না কেন বিবাহত্তোর সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত নয়।	শুধুমাত্র পৃথক সম্পত্তি। সংসারে স্ত্রীর অবদান যাই থাকুক না কেন বিবাহত্তোর সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত নয়।	শুধুমাত্র পৃথক সম্পত্তি। সংসারে স্ত্রীর অবদান যাই থাকুক না কেন বিবাহত্তোর সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত নয়।
সংস্থা	স্থানীয় সালিশী পরিষদ, পারিবারিক আদালত এবং আপীল আদালত	পারিবারিক আদালত ও আপীল আদালত	পারিবারিক আদালত ও আপীল আদালত । তালাকের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মুখ্য জুরিসডিকশান রয়েছে।

মুসলিম পারিবারিক আইন

বেশির ভাগ বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য সুন্নি হানাফী আইন প্রযোজ্য।[৬৩] মুসলিম পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৬১ আইনে এই মতবাদের কিছু অংশ সংকলন ও সংশোধন করা হয়েছে।[৬৪] অন্যান্য আইন যেগুলি মুসলিম বিবাহ এবং বিচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত সেগুলি হলো মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন-১৯৩৯ এবং মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধীকরণ) আইন- ১৯৭৪।

বিবাহ চুক্তি ও নিবন্ধীকরণ

মুসলিম বিবাহ একটি চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় যা কাবিননামা বা নিকাহনামা নামে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকারের একটি আর্দশ কাবিননামার ফরম্যাট রয়েছে যেটা গ্রহণ করা যেতে পারে।[৬৫] কাবিননামাতে

[৬৩] মুসলিম পারিবারিক আইন (শরিয়া) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭।

[৬৪] বাংলাদেশ (বিদ্যামান আইন বহালকরন) আদেশ ১৯৭২।

[৬৫] মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধীকরন) আইন ১৯৭৪, বিধি-৯।

ব্যক্তিগত তথ্য যেমন পাত্র-পাত্রীর নাম, জন্মস্থান, বৈবাহিক অবস্থা, পাত্র-পাত্রীদের বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন শর্ত, যেমন দেনমোহর কিংবা ভরণপোষণের পরিমাণ ইত্যাদি উলেস্নখ করার সুযোগ রয়েছে।[৬৬] একটি আদর্শ কাবিননামাতে বিবাহের উভয়পড়্গের জন্য 'বিশেষ শর্ত' যেমন, তালাক বা বিচ্ছেদ পরবর্তীতে কি হবে তা সংযোজনের সুযোগ রয়েছে।[৬৭]

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যে ৭১ জন নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে তাদের মধ্যে এই কাবিননামার গুরম্নত্ব বা এর বিধিগুলির মাধ্যমে কিভাবে নিজেদের অধিকার সমঝোতার মাধ্যমে সংরড়্গণ করা যায় সে বিষয়ে জ্ঞান বা জানাশোনার পরিধি অত্যন্ত সীমিত।[৬৮] মুসলিম বিবাহ অবশ্যই ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার বা কাজী দ্বারা নিবন্ধিত হতে হবে। ১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধীকরণ) আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার সনদপ্রাপ্ত কাজীদের নিয়োগ করে থাকেন। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রাররা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন অনেক নারীই অসচেতনতা ও দারিদ্রতার কারণে বিবাহ নিবন্ধনে ব্যর্থ হন।[৬৯] উদাহরণস্বরম্নপ বলা যেতে পারে একজন মুসলিম বিধবা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর সাড়্গাৎকারে বলেছেন, তিনি তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন কোরআনের উপর বর-কনের হাত রেখে শপথ করে। কারণ তার পড়্গে কাবিনের টাকা, বরের যৌতুকের দাবি বা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা করার সামর্থ ছিলনা এবং এই দম্পতি পরে বিবাহ নিবন্ধন করেননি।[৭০] আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন, এই ধরনের প্রথা প্রচলন থাকার কথা।[৭১] কাজী এবং মানবাধিকার কর্মীরা বলেন, অনেকই এফিডেফিট এর মাধ্যমে নোটারীর কাছে বিবাহ করেন যেটার কোন আইনী বৈধতা নাই।[৭২]

দেনমোহর

মুসলিম বিবাহ চুক্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, স্বামীকে তার স্ত্রীকে অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা সম্পত্তি মোহর হিসেবে দিতে হবে।[৭৩] এর একটা অংশ বিয়ের সময় বাকীটা পরবর্তী সময় পরিশোধ করতে হবে। তত্ত্বগতভাবে দেখলে দেনমোহরের অধিকারটা নারীদের সম্পত্তির অধিকার অনেকাংশে সংরড়্গণ করতে পারে। কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যে সকল নারীদের সাড়্গাৎকার নিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে মোহরানা নির্ধারণে নারীদের খুবই কম বা কোন ভূমিকাই নাই এবং

---

[৬৬] পূর্বোক্ত, অতিরিক্ত তথ্যের জন্য"মোহর" এবং "ভরণপোষণ" শিরোনামের অধ্যায়গুলি দেখুন।

[৬৭] মুসলিম বিবাহ এবং তালাক (নিবন্ধনীকরণ) বিধি ১৯৭৫, বিধি ৯, কাবিনামার ১৭, ১৯ এবং ২০ কলাম।

[৬৮] মে-জুন ২০১১ সালে ঢাকা, নোয়াখালী, মাদারীপুর, এবং গাজীপুর জেলায় মুসলিম নারীদের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার বেশীরভাগ নারীরাই জানতেন যে তারা বিয়ের মোহর নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারতো কিন্তু তারা কাবিনামাতে অন্যকোন শর্ত যোগ করে সমঝোতার কথা জানতেন না। কিছু ক্ষেত্রে যেখানে নারীরা বৃদ্ধ যারা বলেছেন, যে সময় তাদের বিয়ে হয়েছে সেই সময় কোন নির্দিষ্ট কাবিন নামা ছিল না। কর্মীরাও এই কথা নিশ্চিত করেছেন।

[৬৯] মে, ২০১১ নোয়াখালী ও মাদারীপুর জেলার ৫ জন ম্যারেজ রেজিষ্টারের (অনুরোধে নাম প্রকাশ করা হয়নি) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[৭০] ২০ মে ২০১১ সালে নোয়াখালী জেলার মুসলিম নারী জোবাইদার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[৭১] ২৫ মে ২০১১ সালে আইন ও সালিশকেন্দ্রের সিনিয়র উপ-পরিচালক, মেডিয়েশন ও র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট, নীনা গোস্বামীর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাথে সাক্ষাৎকার।

[৭২] পূর্বোক্ত। ১৯ মে, ২০১১ আইন ও সালিশকেন্দ্রের সিনিয়র উপ-পরিচালক, মেডিয়েশন ও র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট, নীনা গোস্বামীর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাথে সাক্ষাৎকার। অনেক নারীরাই হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন যে, তারা নিবন্ধন ছাড়াই বিবাহ করেছেন এবং বিশ্বাস করেন এটা বৈধ। ১৯ মে ২০১১ সারে ঢাকাতে মুসলিম নারী মুনিরার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।.

[৭৩] মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধীকরন) বিধিমালা ১৯৭৫ বিধি ৯, নিকাহনামা। মোহর যৌতুক থেকে ভিন্ন, যৌতুক গভীরভাবে বিস্তৃত একটি সামাজিক প্রথা যেটা স্বামী বা স্বামীর পরিবার বিয়ের সময় এবং বিয়ে পরবর্তীতে কনের পক্ষের নিকট থেকে টাকা, উপহার বা অন্য কোন সম্পত্তির হিসাবে দাবী করেন।

বেশিরভাগ নারী জানেননা তার দেনমোহরের পরিমাণ কত ছিল।[৭৪] যে পদ্ধতিতে দেনমোহর নির্ধারন করা হয় সেখানে সমস্যা রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি ও জীবনযাত্রামানের বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবন শেষে এক সময়ে এই মোহরের পরিমাণ খুবই নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নারীদের এবং প্রাক্তন পারিবারিক আদালতের বিচারকদের মোহরানার বিষয়ে সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখেছে যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেবার ক্ষেত্রে এই মোহরানার পরিমাণ খুবই কম। দুইটি মামলায় দেখা গেছে, দুজন নারী বিয়ের একযুগ পরে মোহরানা দাবী করেছে- এক মামলায় মোহরের পরিমাণ ১০১ টাকা[৭৫] এবং অন্য মামলায় ২.৫ টাকা।[৭৬] হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সংরক্ষণে অন্যান্য যে মামলাগুলি রয়েছে সেখানে মোহরানা ৫১ হাজার পাচঁশত টাকা এবং ৬০০ টাকা মাত্র।[৭৭] অন্য জায়গায় দেখা গেছে যে, স্বামী এত বেশী মোহরানা ধার্য করেছে যে সে যে পরবর্তীতে ঐ মোহরানা পরিশোধ করতে পারে তার কোন নিশ্চয়তা নাই এবং যখন বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তখন মোহরানার কিছুই পরিশোধ করে নাই, অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার নামে মোহরানা শুধুই কাগজে কলমে।[৭৮] স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ পরবর্তীতে যে কোন বকেয়া দেনমোহর পাবার অধিকারী কিন্তু নারীদের পক্ষে এই অধিকারের আইনটা বাস্তবায়ন করা দু:সাধ্য।[৭৯]

বহুবিবাহ

> "দুই স্ত্রী দুই সন্তান - একজন স্কুল শেষ করতে পারেনি, এখন রিকশা চালায়, আরেক সন্তান কলেজ শেষ করেছে"।
> মাকসুদা আক্তার, আইনজীবী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, জুন ১, ২০১১।

> "কিসের অনুমতি? স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার আগে একটা কথাও বলেনি। তারা যখন চায় তখনই বিয়ে করতে পারে"।
> আছমা (ছদ্মনাম), মুসলিম, নোয়াখালী জেলা, ২০ মে, ২০১১।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বহু বিবাহের প্রচলন অহরহ, যদিও কিছু কিছু সূত্র বলছে এটার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।[৮০] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে কমপক্ষে ৪০ জন নারী বহু বিবাহের মধ্যে রয়েছেন এবং সবগুলি ঘটনাতেই দেখা যায়, এসকল নারীর অধিকারের ওপর বহু বিবাহের অত্যন্ত

---

[৭৪] মে ও জুন ২০১১ সালে ঢাকা , গাজীপুর মাদারীপুর ও নোয়াখালী জেলার কমপক্ষে ৫০ জন মুসলিম নারীর সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আরো অনেক নারীদের সাথে কথা বলেছেন যারা জানতেনা তাদের মোহর কত ছিল্। তারা অনেকেই হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন যে তারা একটি সাদা কাগজে আঙ্গুলের ছাপ দিয়েছেন এবং পরে শুনেছেন ওটাই কাবিন নামা। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার- শাহনাজ (ছদ্মনাম) মুসলিম, নোয়াখালী জেলা, ২০ মে ২০১১, আনোয়ারা (ছদ্মনাম) মুসলিম, নোয়াখালী জেলা, ২১ মে, ২০১১ ফরিদা (ছদ্মনাম) মুসলিম, নোয়াখালী জেলা, ২২ মে, ২০১১।

[৭৫] একজন প্রাক্তন বিচারকের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার (অনুরোধে নাম ও বিস্তারিত বর্ণনা উলেস্নখ করা হলো না)।

[৭৬] ২০ মে, ২০১১ তারিখে নোয়াখালী জেলার মুসলিম নারী আখতারার (ছদ্মনাম) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[৭৭] ২০ ও ২১ মে, ২০১১ তারিখ নোয়াখালী জেলার আমিরা (ছদ্মনাম) এবং জোবাইদার (ছদ্মনাম) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[৭৮] হিউম্যান রাইস ওয়াচের বিভিন্ন পরিমানের মোহরের তথ্য সংগ্রহ করেছে। অনেকক্ষেত্রেই মোহরের পরিমান ৫০,০০০ টাকা কম এবং হিউম্যান রাইস ওয়াচের সংগ্রহীত তথ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ মোহর ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

[৭৯] পরবর্তী "আইনী প্রতিবন্ধকতা" অধ্যায়টিতে দেখুন।

[৮০] উদাহরণস্বরূপ দেখুন; OECD, "Social Institutions and Gender Index," http://genderindex.org/country/bangladesh (accessed April 3, 2011)|

বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বেশির ভাগ নারীরাই বলেছেন স্বামী আরেকটা বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। যার কারণে তারা বাসগৃহ এবং অর্থনৈতিক সহযোগতির অধিকার হারাচ্ছেন।৮১ কেউ কেউ আবার বলেছেন বহু বিবাহ এবং পারিবারিক নির্যাতনের মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। যখনই স্ত্রীরা স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে তখনই স্বামীরা মারধর শুরু করে।৮২ একজন অধিকার কর্মী একটা ঘটনার কথা বলেছেন- যেখানে স্ত্রী তার স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করায় স্বামী তাকে এসিড নিক্ষেপ করেছে।[৮৩] শরীয়া আইন অনুযায়ী একজন পুরুষ চারটা পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এই ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতিগত রক্ষাকবজের বিধান করেছে।[৮৪] একজন পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইলে তাকে স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যানের বরাবর আবেদন করতে হবে এই মর্মে যে, তার বর্তমান স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন।[৮৫] এরপর চেয়ারম্যান সালিশী পরিষদ ডাকবেন, যেখানে তিনি নিজে থাকবেন এবং স্বামী ও স্ত্রীর উভয় পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা প্রতিনিধিরা থাকবেন। এই পরিষদ শুধুমাত্র তখনই অনুমতি দেবে যখন তারা সন্তুষ্ট হবেন যে বিবাহের প্রস্তাব "প্রয়োজনীয় ও ন্যায় সঙ্গত"[৮৬] এবং বিবাহে শর্ত যুক্ত করতে পারবেন।[৮৭] প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত বলতে কি বোঝায় তা আইনে ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধিতে একটা বিস্তারিত তালিকা রয়েছে যখন বহু বিবাহকে প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত গণ্য করা হবে। সেগুলি হল- বর্তমান স্ত্রীর সন্তান ধারণের অক্ষমতা, শারিরীক প্রতিবন্ধকতা, দাম্পত্য সম্পর্ক পালনে শারীরিক অক্ষমতা, দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধারে আদালতের ডিক্রি না মানা।[৮৮] তত্ত্বগতভাবে এই সালিশী পরিষদ স্বামীদের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেবার সময় বর্তমান স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কিছু অতিরিক্ত শর্ত জুড়ে দিতে পারেন।[৮৯] যে সকল পুরুষ এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ তারা বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের মোহরানা পরিশোধ করতে বাধ্য[৯০] এবং স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারেন যার শাস্তি সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদন্ড বা ১০,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করতে পারেন।[৯১] বিবাহ চুক্তিতে বর-কনে তাদের বৈবাহিক অবস্থার কথা উলেস্নখ করতে বাধ্য এবং ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার সেটা যাচাই করে দেখবেন। আদর্শ কাবিননামা চুক্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাওয়া হয় যে, পাত্রের কোন বর্তমান স্ত্রী রয়েছে কিনা, যদি থাকে তাহলে সে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য সালিশী পরিষদ থেকে যথাযথ অনুমতি নিয়েছে কিনা।[৯২] কাবিননামা নারীদেরকে অতিরিক্ত

---

[৮১] মে, জুন সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০১১ তারিখে ঢাকা, নোয়াখালী, মাদারীপুর এবং গাজীপুর জেলার নারীদের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[৮২] ১৯ মে, ২০১১ তারিখ ঢাকা জেরার মুসলিম নারী শর্মিলা (ছদ্মনাম) ২২ মে ২০১১ তারিখ নোয়াখালী জেলার মুসলিম নারী হামিদা, ৪ জুন ২০১১ তারিখ গাজীপুর জেলার মুসলিম নারী নিম্মি (ছদ্মনাম), ১৯ মে, ২০১১ তারিখ ঢাকা জেলার মুসলিম নারী শেফালী (ছদ্দনাম) ২২ মে,২০১১ নোয়াখালী জেলার ফরিদা, মহসিনা এবং সাইদার (ছদ্মনাম) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[৮৩] ৩১ মে ২০১১ তারিক ঢাকা জেলার মুসলিম নারী মালেকা (ছদ্মনাম) তার সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[৮৪] মুসীলম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ ধারা ৬।

[৮৫] পূর্বোক্ত

[৮৬] পূর্বোক্ত

[৮৭] পূর্বোক্ত

[৮৮] মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা ১৯৬১, বিধি ১৪।

[৮৯] মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ ধারা (৬), মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯, ধারা ২৯(ররধ)।

[৯০] পূর্বোক্ত।

[৯১] পূর্বোক্ত।

[৯২] নিকাহনামা, বাংলাদেশ মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধীকরণ) বিধিমালা ১৯৭৫, বিধি ৯, কলাম ২১।

সুরক্ষার জন্য সমঝোতাতে সহায়তা করে, যেটা আইনজীবীরা মনে করেন বহু বিবাহ রোধের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সুরক্ষার কাজ করতে পারে।৯৩ যেমন ময়মনসিংহের একজন আইনজীবী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেন, তার একজন মক্কেল কাবিননামাতে শর্ত দিয়েছিল যে, যদি স্বামী পুনরায় বিয়ে করে তাহলে তার জন্য পৃথক বাসগৃহের ব্যবস্থা করবে।[৯৪] মুসলিম পারিবারিক আইনে কোন স্বামী একাধিক স্ত্রী রাখলে তাদের প্রতি সমতার (এটা ব্যবহার করা হয়েছে মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশে) বা সমভাবে (এটি ব্যবহার করা হয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে) মূল্যায়ন করবে।[৯৫] বহু বিবাহ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য আইনের পদ্ধতিগুলো খুব দুর্বলভাবে প্রয়োগ হয়। নারী, বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন স্থানীয় সরকার যারা বহু বিবাহের বিষয়টি দেখার দায়িত্বে রয়েছেন তারা তাদের কর্তব্য ঠিকমত পালন করেন না। তাদের প্রশিক্ষণে দুর্বলতা এবং এই বিষয়ে জ্ঞানের খুবই অভাব যা বিবাহের নিবন্ধন পদ্ধতির দুর্বলতা ও বহুবিবাহ রোধে আইনী সুরক্ষার পথে বাধা। মাদারীপুর লিগ্যাল এইড সংস্থার এক কর্মীর মতে বেশীর ভাগ সালিশী পরিষদই অকার্যকর- "সালিশী পরিষদগুলোকে কার্যকর করার জন্য অনেক কাজ করতে হবে। তাদের দায়িত্ব পক্ষদেরকে নোটিশ দেওয়া, যখন তারা বহু বিবাহের দরখাস্ত পান তখন পক্ষগণকে সমঝোতার জন্য ডাকা এবং এই বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।"[৯৬] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যে ৪০ জন মুসলিম নারী যারা বহুবিবাহের মধ্যে আছেন তাদের সাক্ষাৎকর নিয়েছেন তারা সকলেই বলেছেন তারা স্বামীদের আরেকটা বিবাহের কথা ঘটনা ঘটার অনেক পরে স্বামী, শ্বশুরবাড়ীর লোকজন অথবা পরিবারের অন্য সদস্য বা বন্ধুর কাছে শুনেছেন। তাই যদিওবা তিনি এর বিরুদ্ধে কিন্তু এটার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার কোন সুযোগ ছিলনা। তাদের মধ্যে কেউ সালিশী পরিষদে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন নাই যদিও আইন এটা বলছে। যেমন সায়রার স্বামী তার অনুমতি না নিয়ে বহুবার বিয়ে করেছেন। সায়রা বলেছে- "যখন আমার ছেলের বয়স এক বছর তখন আমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে, আমি এটা জানতাম না। কিন্তু একদিন সে দ্বিতীয় স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে এল। দ্বিতীয় স্ত্রীও জানত না যে তার আগের বৌ আছে। সে আমাদের সাথে তিন বছর ছিল, তারপর চলে যায়। তারপর আবার আমার স্বামী চলে যায় এবং আরেকটি বৌ নিয়ে আসে। যখন সে চতুর্থ বিয়ের জন্য যায় তখন আমি বুঝতে পারি, কারণ মেয়ে পক্ষ বিয়ের আয়োজন করছিল এবং এটা একই এলাকার মধ্যে।"[৯৭] রিনারও কোন সুযোগ ছিল না তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে প্রতিরোধ করার, যখন সে শ্বশুরবাড়ীর একটা ফোনে জানতে পারল যে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা এই বিয়ের আয়োজন করেছে। তার স্বামী তাকে বলেছিল সে তার মায়ের চাপে পড়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। তা না হলে তার মা আত্মহত্যা করতো। রিনা বলেছে "আর আমি যদি আত্মহত্যা করি সেটা ঠিক হত?"[৯৮] নারীদের জন্য সালিশী পরিষদে যেয়ে তাদের স্বামীদের বহুবিবাহের দরক্ষাস্ত প্রতিরোধ

---

[৯৩] ১লা এপ্রিল ২০১১ তারিখ ঢাকাতে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্টের জেলা পর্যায়ের আইনজীবীদের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের আলোচনা সভা ।

[৯৪] পূর্বোক্ত।

[৯৫] জেসমিন সুলতানা বনাম মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯৯৭) ১৭ ইখউ ৪।

[৯৬] ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুরে মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের কর্মী নমিতা রানী দত্তের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[৯৭] ২০ মে ২০১১ নোয়াখালী জেলার মুসলিম নারী সায়রার (ছদ্মনাম) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[৯৮] ২৪ মে, ২০১১, ঢাকা জেলার মুসলিম নালী রীনার (ছদ্মনাম) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

করা খুবই দু:সাধ্য। কিছু কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন সালিশী পরিষদে খুবই কম নারীদেরকে সালিশদার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। যেটা নারীদের জন্য আরো অস্বস্তিকর।[৯৯] একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেছেন সালিশী পরিষদের সদস্য হিসেবে নারীদের নিযুক্ত করা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এতে করে নারীরা নিঃসংকোচে ও মুক্ত মনে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারবেন এবং সদস্যরাও তাদের সমস্যাগুলি বুঝবেন। কিছু ক্ষেত্রে নারীরা যখন সালিশী পরিষদে আসেন তখন তারা পুরুষ সদস্যদের সাথে কথাই বলেন না।[১০০] স্থানীয় কর্মকর্তা যারা সালিশী পরিষদ কার্যকর রাখার দায়িত্বে আছেন তারা সরকার থেকে খুবই স্বল্প প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।[১০১] তাছাড়া সালিশী পরিষদগুলির সার্বিক অনেক দুর্বলতা রয়েছে যেটা দেখার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের। বহুবিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় কর্মকর্তাদের কার্যবলী ও প্রতিবেদন সংগ্রহের একটি প্রক্রিয়া এই মন্ত্রণালয়ের রয়েছে।[১০২] বহুবিবাহের ক্ষেত্রে দূর্বল বিবাহ নিবন্ধন পদ্ধতি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য বিবাহ নিবন্ধনের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এটা থাকার পরও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, এটি বহুবিবাহ প্রতিরোধে তেমন কোন কাজ করছে না। অ-নিবন্ধীকরণ বিবাহকে অবৈধ করেনা। নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি কম্পিউটারাইজড নয়, জেলাগুলোর মধ্যেও কোন সমন্বয় নেই। তাই পুরুষ ইচেছ করলে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় গিয়ে অনেকগুলি বিবাহ নিবন্ধন করতে পারেন।[১০৩] কিছুদিন আগেও একজন পুরুষ একই জেলায় প্রতারণার মাধ্যমে ভিন্ন নাম দেখিয়ে একাধিক বিয়ে নিবন্ধন করতে পারতো, কিন্তু ২০১১ সালে নতুন নিয়ম অনুযায়ী বিবাহের পক্ষগণকে বিবাহের সময় ভোটার আইডি কার্ড দেখাতে হবে। [১০৪]

তালাক

বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইন আদালত ব্যবস্থার বাইরে বিভিন্ন ধরনের তালাক অনুমোদন করে। সবচেয়ে বেশী দেখা যায় বিনা কারণে একতরফা তালাক। পুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো। অন্যদিকে নারীদেরও বিনা কারণে তালাক দেবার ক্ষমতা রয়েছে সেখানে যেখানে স্বামী কাবিননামাতে স্ত্রীকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন।[১০৫]

বিনা কারণে তালাকের এই ক্ষমতার পাশাপাশি স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ সম্মতির মাধ্যমে তালাক হতে পারে (মুবারত)। খুলা তালাকের প্রচলন কম, এই তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী তালাক দাবি করে এবং সেখানে স্বামীর

---

[৯৯] ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের কর্মী নমিতা রানী দত্ত এবং ইউরেকা আক্তারের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[১০০] ২৮ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুর জেলার ইউনিয়ন পরিষদ সভাপতি কাজী আবুল বাশারের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার। আরো দেখুন; আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিনের, *Shari'a law and society: Tradition and Change in the Indian Subcontinent* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1991), যেখানে ১৯৯১ সালের একটা গবেষণা উলেখ করে বলা হয় পুরুষ প্রধান সালিশি পরিষদ খুবই কম ক্ষেত্রে পুরুষদের পুনরায় বিবাহের আবেদন নাকোচ করে।

[১০১] ১৯ মে ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির মিতালী জাহান (কর্মসূচী কর্মকতা); ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারী পুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের নমিতা রানী দত্ত এবং ইউরেকা আক্তার ; মাদারীপুর ও নোয়াখালী জেরার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[১০২] ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের কর্মী নমিতা রানী দত্ত ও ইউরেকা আক্তারের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[১০৩] মে ২০১১ তে নোয়াখালী ও মাদারীপুর জেলার ম্যারেজ রেজিষ্টারদের (অনুরোধে নাম অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[১০৪] পূর্বোক্ত।

[১০৫] পূর্বোক্ত।

সম্মতি আবশ্যক। অধিকার কর্মী, আইনজীবী এবং কাজীরা বলেছেন (যেটা বিতর্কিত) এই ধরনের তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে একটা মূল্য দিতে হয় - সাধারণত সেটি টাকার বিনিময়ে বা মোহরের দাবী ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে হয়।[১০৬] ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহ বিচেছদ আইনের অধীনে আরেক ধরনের তালাকের প্রচলন রয়েছে যেটা হলো নারীরা আদালতের কাছে তালাকের আবেদন করতে পারেন। এই আইনে নারীরা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তালাক চাইতে পারেন তা সুর্নিদিষ্ট করা আছে।[১০৭] বিশেষজ্ঞরা বলেছেন- এটা বৃহৎ পরিসরে ব্যবহার করা হয়না, কারণ আদালতে পদ্ধতিগত জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে। স্বামীর একতরফা বিনা কারণে তালাক দেবার ক্ষমতাকে কিছুটা সংরক্ষণ করার জন্য মুসলিম পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে কিছু পদ্ধতিগত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তালাক কার্যকর করা জন্য। এই আইন অনুযায়ী পক্ষগণ তালাক দিতে চাইলে (সাধারণত স্বামী, তবে কাবিননামায় ক্ষমতা দেওয়া থাকলে স্ত্রীও) যে পক্ষ তালাক চাইবে তাকে অন্য পক্ষকে এবং স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যানকে নোটিশ দিতে হবে। নোটিশ পাবার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সমঝোতা করার জন্য সালিশী পরিষদ গঠন করবেন। যদি পক্ষদ্বয় সমঝোতা না করে তবে চেয়ারম্যান নোটিশ পাওয়া থেকে ৯০ দিনের পর তালাক কার্যকর হবে, আর যদি স্ত্রী গর্ভবর্তী হন তাহলে সন্তান জন্মের পর।[১০৮] নারী, আইনজীবী ও অধিকার কর্মীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন পুরুষরা তালাক দেবার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির পাত্তাই দেয় না বা যথেচ্ছ ব্যবহার করে। যেমন নোটিশে পূর্বের তারিখ দেখায় যাতে করে এই ৯০ দিনের ভরণপোষণ না দিতে হয়।[১০৯]

ভরণপোষণ

অ-সংকলিত মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী স্বামী বৈবাহিক অবস্থায় তার স্ত্রী বা স্ত্রীগণের ভরণ পোষণ করতে বাধ্য। এর মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, ও নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রী এই ভরণপোষণের অধিকার তখনই পাবে যখন সে ভাল চরিত্রের অধিকারী এবং স্বামীর প্রতি বাধ্য থাকবে।[১১০] স্ত্রী বিবাহের চুক্তিতে এই ভরণপোষণের পরিমাণ ও শর্ত সুনির্দিষ্ট করে উলেস্নখ করে দিতে পারেন।[১১১] হিউম্যান রাইটস ওয়াচের

---

[১০৬] মেডিয়েশন এ- র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিটের সিনিয়র ডেপুটি ডিরেক্টর নীনা গোস্বামীর সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৯ মে ২০১১; দশ বছরেরও অধিক সময় ধরে লাইসেন্সধারী একজন কাজীর সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার (অনুরোধের প্রেক্ষিতে নাম এবং বিস্তারিত তথ্য অপ্রকাশিত), মে ২০১১; ডেইলী স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত রংপুর পারিবারিক আদালতের এসিস্ট্যান্ট জজ মোহাম্মদ আব্দুর রহমানের লেখা "Khula Talaq and essence of service of notice," *Law and Our Rights,* ২৭ মে ২০০৬, দেখুন: http://www.thedailystar.net/law/2006/05/04/advocacy.htm (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২৩ জুন ২০১২)।

[১০৭] ক্ষেত্রগুলি হলো: স্বামী ৪ বছর ধরে নিখোঁজ, সে দুই বছর ধরে ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে বা অবহেলা করেছে। সে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরন না করে আরেকটি স্ত্রী গ্রহণ করেছে। সে ৭ বছর বা অধিক সময়ের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছে। সে কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত ৩ বছরের অধিক সময় ধরে দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। পুরুষত্বহীনতা, দুই বছর ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন বা কুষ্ঠ বা মারাত্মক যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত। স্ত্রীর ১৬ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ হয়েছে এবং ১৮ বছর পূর্ণ হবার পর স্ত্রী বিবাহ অস্বীকার করে। তবে বিবাহিত থাকা অবস্থায় সহবাস হয়নি। স্বামী তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরন করে (আইনে নিষ্ঠুরতার ধরন বলা হয়েছে) এবং মুসলিম আইনে স্বীকৃত অন্যান্য কারণ। মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯, ধারা ২।

[১০৮] মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ৭।

[১০৯] ১৬ মে ২০১১ তারিখে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আইনজীবী সালমা জেবীন, ১লা জুন ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আইনজীবী মাকসুদা এবং অন্যান্যরা ২৮ মে ২০১১ তারিখ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্টের আইনজীবী ফরিদা ইয়াসমিন ও অন্যান্যদের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[১১০] দেখুন, পেরেরা, *The Fractured Scales*, পৃ-৩০; ড. তাসলিমা মনসুর, *Gender Equity and Economic Empowerment: Family Law and Women in Bangladesh* (Dhaka: British Council, 2008), পৃ-৬৬. প্রফেসর মনসুর বলেছেন "বাধ্য স্ত্রীর শর্তের একমাত্র ব্যতিক্রম হলো যখন স্বামী মোহরের একটা অংশ স্ত্রীকে প্রদানে ব্যর্থ হয় (চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য দেনমোহর)।

[১১১] মুসলিম বিবাহ এবং বিচ্ছেদ (নিবন্ধীকরণ) বিধিমালা ১৯৭৫, বিধি ৯, কলাম ২০।

সাথে যে নারীরা কথা বলেছেন তাদের কারোরই এই সম্ভবনার বিষয়ে কোন ধারণা ছিল না।[১১২] আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন স্বামী যদি বৈবাহিক জীবনে স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হন তবে স্ত্রী আদালতের নিকট ৬ বছর পর্যন্ত অতীত ভরণপোষণ দাবি করতে পারেন।[১১৩] একজন মুসলিম নারী তালাক পরবর্তীতে তালাকের নোটিশ পাবার ৯০ দিন পর্যন্ত বা যদি সন্তানসম্ভবা হন তাহলে সন্তান জন্ম না হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণ পাবার অধিকারী।[১১৪] বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের একটি রায় পরিবর্তন করে একটি বিতর্কিত রায়ে বলেছেন যে, ইসলামিক আইনের হানাফী মতবাদ মুসলিম নারীদের তালাক পরবর্তী ভরণপোষণের অধিকার দেয় না।[১১৫] অনেক নারী অধিকার কর্মী এবং আইনজীবীরা এই রায়ের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন সুপ্রীম কোর্টের এই ব্যাখ্যাটি খুবই টেকনিক্যাল এবং ত্রুটিপুর্ণ।[১১৬]

হিন্দু পারিবারিক আইন

হিন্দু বিবাহ ও বিচ্ছেদ হিন্দু আইনের দায়ভাগা মতবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়। শুধুমাত্র হিন্দু বিবাহিত নারীর পৃথক বাসগৃহ ও ভরণপোষণের আইন- ১৯৪৬ ব্যতীত অন্যান্য সকল আইনই অ-সংকলিত।

বিবাহ এবং বহু বিবাহ

হিন্দু বিবাহ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, কোন বিবাহ চুক্তি বা নিবন্ধনকরণের প্রয়োজন হয় না।[১১৭] আইনজীবীরা বলেছেন যে, অনেক হিন্দু নারী জানেন না আইনের দৃষ্টিতে একটা বৈধ ধর্মীয় বিবাহ অনুষ্ঠান বলতে কি বুঝায়।[১১৮] কিছু কিছু হিন্দু দম্পতি কোন ধর্মীয় আচারের মধ্যে না গিয়ে শুধুমাত্র ভগবত গীতার উপর হাত রেখে বিবাহ সম্পন্ন করেন।[১১৯] আইনজীবীরা আরো বলেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিবাহের পক্ষগণ নোটারীর কাছে যান এবং একটা সাধারণ এফিডেফিট তৈরী করে ঘোষণা দেন তারা স্বামী স্ত্রী, তারা কোন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার ভিতর যান না।[১২০] বিবাহের নিবন্ধন না থাকায় যে সকল নারী তাদের স্বামী থেকে পৃথক হয়ে ভরণপোষণের আবেদন করেন তাদের জন্য আদালতে বিবাহ প্রমাণ করা কষ্টকর। আইনজীবী এবং নারী অধিকার কর্মীরা বহু বছর ধরে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন

---

[১১২] মে এবং জুন ২০১১ তারিখে ঢাকা, নোয়াখালী মাদারীপুর এবং গাজীপুর জেলার মুসলিম নারীদের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[১১৩] জামিলা খাতুন বনাম রোস্তম আলী, ১৬ BLD(Ad) (১৯৯৬)৬১।

[১১৪] পেরেরা, *The Fractured Scales*, পৃ-২৯।

[১১৫] মো: হেফজুর রহমান বনাম শামসুন্নাহার বেগম ১৫ BLD (১৯৯৫) ৩৪।

[১১৬] ১৭ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে আইনজীবী ফৌজিয়া করিম এবং ৩০ মার্চ ২০১১ তারিখ ব্রাক এবং হিউম্যান রাইটস ও লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস এর পরিচালক ড. ফষ্টিনা পেরেরার সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[১১৭] অমূল্যচন্দ্র মোদক বনাম রাষ্ট্র ৩৫, DLR, ১৬০ (১৯৮৩) আরো দেখুন ড. শাহানা হুদা, "'Double Trouble': Hindu Women in Bangladesh—A Comparative Study," *Dhaka University Studies, Part-F,* vol. 9 issue 1,1998, পৃ-১১১।

[১১৮] অমূল্য চন্দ্র মোদক বনাম রাষ্ট্র, পূর্বোক্ত, মামলায় আদালত বির্তর্কিতভাবে বলেছেন যে, একটি হিন্দু বৈধ বিবাহের জন্য দুইটি ধর্মীয় আচার সম্পন্ন হতে হবে। একটি হলো আগুনের সম্মুখে শপথ এবং আরেকটি সপ্তপদী (সাত পাক ঘোরা) মে ২৫, ২০১১ তারিখ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্টের উপরিচালক (আইন) ফরিদা ইয়াসমিন, ১৯ মে ২০১১ সালে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সিনিয়র উপপরিচালক নীনা গোস্বামী এবং ৩০ মার্চ ২০১১ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শাহানাজ হুদার সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[১১৯] পুর্বোক্ত।

[১২০] মে ২০১১ সালে নোয়াখালী ও মাদারীপুর জেলার ৫ জন কাজীর সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার। (অনুরোধের প্রেক্ষিতে নাম প্রকাশ করা হয়নি)।

বাধ্যতামূলক করার আইন পাশের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের শক্ত প্রতিবাদের জন্য সেটা সম্ভব হচ্ছে না। হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন, জনগণের প্রবল বাধা থাকা সত্ত্বেও অনেক হিন্দু নেতারা ব্যক্তিগতভাবে নিবন্ধন পদ্ধতি চান। তিনি বলেন, "হিন্দু নেতারা বিবাহ নিবন্ধনের বিপক্ষে কিন্তু যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমস্যায় পড়েন যেমন পুত্র বিদেশে যাবে তখন তারা ঢাকেশ্বরী মন্দীরে আসে বিয়ের সনদ পত্র নেবার জন্য। প্রতি সপ্তাহে আমরা ৪/৫টি সনদপত্র প্রদান করছি এই মর্মে যে, এই মন্দিরে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।"[১২১] ২০১২ সালের মে মাসে বাংলাদেশ মন্ত্রীপরিষদ হিন্দু বিবাহের ঐচ্ছিক নিবন্ধনকরণ আইনের অনুমোদন দিয়েছেন।[১২২] হিন্দু আইন পুরুষদের বহুবিবাহ অনুমোদন করে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের কোন সীমা বা পূর্বশর্ত ছাড়াই । যদি স্বামী পুনরায় বিবাহ করে তবে স্ত্রী পারিবারিক আদালতে পৃথক বাসগৃহ ও ভরণপোষণের আবেদন করতে পারেন।[১২৩]

পৃথকীকরণ ও ভরণপোষণ

বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইনে তালাক অনুমোদিত নয়। ১৯৪৬ সালের বিবাহিত হিন্দু নারীর পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষণ আইন অনুযায়ী হিন্দু নারীরা কিছু কিছু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আদালতের নিকট পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষণের ডিক্রি চাইতে পারেন। ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে- স্বামী যদি কু-রোগে আক্রান্ত হন যেটা স্ত্রীর মাধ্যমে সংক্রমিত হয়নি, স্ত্রীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে রেখেছে যেটা তার সাথে বসবাসের জন্য নিরাপদ বা প্রত্যাশিত নয়, স্বামী স্ত্রীকে না বলে তাকে পরিত্যাগ করেছেন, পুন:বিবাহ, অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে, রক্ষিতা রেখেছে বা অভ্যাসগত কারণে রক্ষিতার সাথে বসবাস করছে এবং অন্যান্য ন্যায় সংগত কারণ।[১২৪] একজন হিন্দু নারী ভরণপোষণের অধিকার পাবেন না যদি সে অসতী বা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত বা দাম্পত্য সম্পর্ক পুন:রুদ্ধারে আদালতে ডিক্রি পালনে ব্যর্থ হন।[১২৫]

---

[১২১] ৩ অক্টোবর ২০১১ সালে হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি এবং সদস্য কাজল দেবনাথের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[১২২] "ঢাকা ফর হিন্দু ম্যারেজ ল", দি হিন্দু, মে ২২, ২০১২, http://www.thehindu.com/news/international/article3443443.ece (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২২ মে ২০১২); "Registration Optional for Hindu Marriage," ২১ মে ২০১২; http://www.thedailystar.net/newDesign/latest_news.php?nid=37859 (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২২ মে ২০১২)।

[১২৩] বিবাহিত হিন্দুনারীর পৃথক বাসগৃহ এবং ভরণপোষণ আইন ১৯৪৫ ধারা ২।

[১২৪] পুর্বোক্ত।

[১২৫] বিবাহিত হিন্দু নারীর পৃথকবাসগৃহ এবং ভরণপোষণ আইন ১৯৪৬, ধারা ২।

নম্রতার ঘটনা[১২৬]

হিন্দু ব্যক্তিগত আইনে তালাক অসম্ভব তাই এমন কি নিষ্ঠুরতম ঘটনার ক্ষেত্রেও যেমনটি ঘটেছে নম্রতার ক্ষেত্রে। নম্রতা একজন ২০ বছরের হিন্দু নারী, বিয়ে করেছিল একজন কারিগরকে যে নিজে একটি ব্যবসা খুলতে চেয়েছিল এবং সেজন্য নম্রতার কাছে টাকা চেয়েছিল। চার বছর হাসপাতালে কাজ করে নম্রতা দুলক্ষ টাকা জমিয়েছিল এবং এর পুরোটাই সে স্বামীর হাতে তুলে দেয়। সেই টাকা নিয়ে স্বামী ব্যবসা না করে বাবা-মাকে টাকাটা দিয়ে দেয়। এরপর নম্রতা সেই টাকা চাইতে শুরম্ন করে এবং সম্পর্কেও তিক্ততা শুরম্ন হয়। নম্রতার স্বামী তাকে মারধর শুরম্ন করে। ২০০৯ সালের এক রাতে নম্রতা যখন অসুস্থ ছিল তার স্বামী তাকে পানি খাওয়ানোর কথা বলে এসিড খাইয়ে দেয়। নম্রতা বলে "সে আমাকে বলে আমি তোমার জন্য খাবার পানি এনেছি, আমি কিছুটা খাবার পর মনে হল আমার মুখ এবং ভিতরটা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে।" নম্রতার স্বামী এই আক্রমনের পর পালিয়ে যায় এবং প্রতিনিয়ত গ্রেফতার ফাঁকি দিয়ে চলছে। আজ পর্যন্ত্ম নম্রতা কিছু খেতে বা পান করতে পারে না । একটি ব্যাগ থেকে একটি টিউবের মাধ্যমে তার পাকস্থলিতে খাবার সরবরাহ করা হয়। নম্রতার গোসল ও বাথরম্নমে যাবার জন্য সার্বক্ষণিক সাহায্য দরকার, তাই তার বিধবা মাকে চাকরী ছেড়ে তার সাথে থাকতে হচ্ছে।

নম্রতা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলে- "সে শুধু ন্যায় বিচারই চায়না, সে তালাক চায়"। "সে বলে আমি তাকে জেলখানাতে দেখতে চাই এবং আমি যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাব তখন আমি তাকে তালাক দেব। যদি আমি তাকে বিয়ে করতে পারি, আমি তালাকও দিতে পারি।" নম্রতা জানেনা যে, তার এই অকল্পনীয় নিষ্ঠুর ঘটনার পরও হিন্দু ব্যক্তিগত আইন তাকে তালাকের অনুমতি দেবে না।

খ্রিস্টান পারিবারিক আইন

খ্রীস্টান বিয়ে ও তালাক ১৯ শতকের দেওয়ানী আইন দ্বারা পরিচালিত। এর মধ্যে মুখ্য আইন হল- খ্রীস্টান বিবাহ আইন- ১৮৭২ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ আইন- ১৮৬৯।

বিবাহ

খ্রীষ্টান বিবাহ দুইজন স্বাক্ষীর সামনে পাদ্রী, সনদপত্রধারী ধর্মীয় মন্ত্রী বা বিবাহ নিবন্ধক দ্বারা সম্পাদিত হয়।[১২৭] বিবাহ অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে।[১২৮] খ্রীস্টান আইনে বহুবিবাহের অনুমতি নাই। ক্যাথলিকদের জন্য চার্চে অনুষ্ঠিত বিয়ে খ্রীস্টীয় ধমীর্য় আইন এবং দেওয়ানী আইন দুইটি দ্বারাই পরিচালিত হয়।

---

[১২৬] ৩১ মে ২০১১ তারিখ নম্রতার সাথে ঢাকাতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার। এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরা রহমানের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ ই-মেইল যোগাযোগ। এই যোগাযোগের মাধ্যমে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নম্রতার চিকিৎসা ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

[১২৭] খ্রিস্টান বিবাহ আইন ১৮৭২, ধারা ৫।

[১২৮] খ্রিস্টান বিবাহ আইন, ১৮৭২ ধারা ২৭-৩৭।

তালাক ও ভরণপোষণ

খ্রীস্টানরা ১৮৬৯ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন অনুযায়ী তালাক দিতে পারে। এই আইন অনুযায়ী স্বামী তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের অভিযোগে তালাক দিতে পারেন।[১২৯] অন্যদিকে স্ত্রীদেরকে অবশ্যই ব্যভিচারের পাশাপাশি অন্য এক বা একাধিক কার্যের প্রমাণ দিতে হবে যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল- স্বামীর অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া, সমকামীতা, অ-অনুমোদিত যৌন সম্পর্ক, ধর্ষণ, বহুগামিতা, পশুর সাথে সহবাস, দুবছর ধরে স্ত্রীকে পরিত্যাগ, পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতা।[১৩০] খ্রীস্টান আইনের তালাকের ক্ষেত্রগুলো এতই সংকীর্ণ যে প্রায়ই স্বামী এবং স্ত্রীরা আদালত থেকে তালাক পাবার জন্য ব্যভিচারের অভিযোগ আনেন যা অনেক সময়ই মিথ্যা হয়ে থাকে। বাংলাদেশী সামাজিক প্রেক্ষাপটে আদালতে নারীদের জন্য এটা খুবই অবমাননাকর অবস্থার তৈরী করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এ রকম নারীদের সাথে কথা বলেছেন যাদের স্বামীরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ এনে আদালতে তালাকের আবেদন করেছে। রিতার স্বামী তাকে একযুগের বেশী সময় ধরে পরিত্যাগ করেছে এবং বিদেশে চলে গিয়েছিল কাজের জন্য। সে এখন বাংলাদেশে ফিরেছে এবং ব্যভিচারের অভিযোগ এনে তালাকের আবেদন করেছে। রিতা বলে "আমি এত বিব্রত হয়েছি যে, আমি যাদেরকে চিনিনা তারা পর্যন্ত এসে আমাকে বলেছে আমার স্বামী যা বলছে তাতে তারা দুঃখিত। আমি খারাপ চরিত্রের নই। আমার প্রতিবেশী, বাবা-মা বা এলাকার মানুষকে প্রশ্ন করুন। এমনকি আমার স্বামীর পক্ষের আইনজীবী আমার কাছে এসে দুঃখ প্রকাশ করেছে।"[১৩১]

২০০৬ সালে বাংলাদেশ আইন কমিশন এই বিবাহ বিচ্ছেদ আইনটি পর্যালোচনা করেছেন এবং সুপারিশ করেছেন যে, বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার ক্ষেত্রে তালাকের পরিসরগুলি আরো প্রশস্ত করা এবং এগুলি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য একই রাখার মাধ্যমে এই আইনে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে অসমতা ও বৈষম্য রয়েছে তা দূর করার প্রয়োজন।"[১৩২] কমিশন আরো বলেছে যে "স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্মতিতে তালাক প্রদানের বিধানকে একটা পরিসর হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে" এবং এই বিধান চালু করার জন্য কমিশন সুপারিশও করেছেন।[১৩৩] তবে বাংলাদেশ সরকার এখনও পর্যন্ত আইন কমিশনের এই সুপারিশ অনুযায়ী তালাক আইনটি সংশোধন করেনি। বিবাহিত নারীর সম্পত্তি অধিকার আইন-১৮৭৪ বিবাহিত খ্রীস্টান নারীদের নিজস্ব মজুরী বা আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য যা বিবাহত্তোর সম্পত্তি থেকে আলাদা। একজন তালাকপ্রাপ্ত বা বিচ্ছেদে থাকা খ্রীস্টান নারীর জন্য ব্যক্তিগত আইন ভরণপোষণের অধিকার দিয়েছে। তবে শর্ত রয়েছে যে তাকে সতী হতে হবে।[১৩৪] খ্রিস্টান নারীরা

---

[১২৯] তালাক আইন ১৮৫৯, ধারা ১০।

[১৩০] পূর্বোক্ত, তালাক আইনের অধ্যায় ৩(১০) -তে বলা হয়েছে "একজন স্ত্রী জেলা আদালত বা উচ্চ আদালতে তালাকের আবেদন করতে পারবেন নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে; স্বামীর খ্রিস্টান ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া এবং অপর কোন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, কারো সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছেন, বহুগামিতা এবং ব্যাভিচার করেছেন, অপর কোন নারীর সাথে বিয়ে এবং ব্যাভিচার, ধর্ষণ, সমকামীতা ও পাশবিকতা, ব্যভিচার ও নৃশংসতা, অ-অনুমোদিত যৌন সম্পর্ক, ধর্ষণ, বহুগামিতা, পশুর সাথে সহবাস, দুবছরের বেশী সময় ধরে স্ত্রীর খোঁজখবর না নেওয়া।"

[১৩১] ২৭ সেপ্টেম্বার ২০১১ তারিখে ঢাকায় রীতা (ছদ্মনাম) ও অক্টোবর ২০১১ তারিখে সারাহ'র (ছদ্মনাম) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[১৩২] বাংলাদেশ আইন কমিশনের, "A Final Report on the Proposed Amendment of the Divorce Act, 1989 (Act IV of 1869) along with a draft of the Divorce Act, 1869 (Amendment) Bill, 200_," 2006, http://www.lawcommissionbangladesh.org/reports/72.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ৫ জুন ২০১২), unpaginated।

[১৩৩] পূর্বোক্ত।

[১৩৪] ড. ফস্টিনা পেরেরার *The Fractured Scales* পৃ: ৫১।

আদালতের নিকট তালাক পরবর্তী ভরণপোষণের আবেদন করতে পারে এবং যদি মামলা চলমান থাকে তবে অন্তবর্তীকালীন ভরণপোষণ চাইতে পারেন।

বিবাহোত্তর সম্পত্তি আইনের অভাব

সংসারে ও পরিবারের সম্পত্তিতে নারীর অনেক গুরন্নত্বপূর্ণ অবদান থাকার পরেও বাংলাদেশে বিবাহত্তোর সম্পত্তি পরিচালনার জন্য কোন আইন নাই। ২০১০ সালের পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন এই ফাঁকটা কিছুটা পূরণ করেছে। এটা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার নারীদের "যৌথ বাসগৃহে" বসবাসের অধিকার দেয়।[১৩৫] এই আইনে পারিবারিক নির্যাতন হিসেবে সে সকল কার্যকে বুঝায় যা "অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ"। এগুলির মধ্যে রয়েছে সেই ধরনের বিষয় যেখানে স্বামী তার স্ত্রীকে সম্পত্তি ব্যবহার ও পরিচালনা হতে দূরে রাখে যে সম্পত্তির অধিকারী সে পারিবারিক সম্পর্কের কারণেই, তার দৈনন্দিন চাহিদাকে অস্বীকার করে এবং বিয়ের সময় উপহার হিসেবে যা পেয়েছে তা ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করে।[১৩৬] যাই হোক, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধের এই আইন ছাড়া কোন দেওয়ানী বা ব্যক্তিগত আইন বিবাহত্তোর সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার বা তালাক পরবতীতে এর বন্টন বিষয়ে কোন স্বীকৃতি, সংজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কোন বিধিমালা নাই।[১৩৭] "বিবাহত্তোর সম্পত্তি" সংক্রান্ত কোন সংকলিত আইন না থাকায় বাংলাদেশে "নিজস্ব সম্পত্তি"র একটা বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী নিজেরা নিজেদের মত করে সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করতে পারেন। একজনের সম্পত্তিতে আরেকজনের ভূমিকা বা সংসারে তার ভূমিকা তালাক পরবর্তী সময়ে ওই সম্পত্তির ওপর কোন দাবীর ক্ষেত্রে স্বীকৃত নয়। যেটা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বেশীর ভাগ সম্পত্তির আনুষ্ঠানিক মালিকানা পুরন্নষদের, সুতরাং এই বাস্তব জীবনের নিজস্ব সম্পত্তির বিষয়টি তুলনামূলকভাবে নারীদের শাস্তি দেয় এবং সংসারে তাদের ভূমিকাকে পাশ কাটিয়ে যায়। এই আইনী বঞ্চনা বাংলাদেশে তালাকপ্রাপ্ত ও পৃথক বসবাসরত নীরাদের পুরন্নষদের তুলনায় অনেক বেশী অর্থনৈতিক কষ্ট ও দারিদ্র্যের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। বৈবাহিক বাসগৃহে বা স্বামীর চাকুরী বা ব্যবসায় স্ত্রীদের কত বড় অবদান রয়েছে

---

[১৩৫] পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ ধারা ১০ সব-১৫ এই আইনের কোন অফিসিয়াল ইংরেজী অনুবাদ নাই। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাষ্টের ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে এই আইন ১০ ধারায় নারীদের যৌথ গৃহে বাস করার অধিকার দেয় এবং ১৫ ধারা আদালতকে এই অধিকার কার্যকরের জন্য বসবাসের অধিকারের আদেশ দেবার ক্ষমতা দেয়।

[১৩৬] পূর্বোক্ত, ত (ঘ) ধারায় আথির্ক ক্ষতির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং ৫টি ক্ষেত্রের বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে আর্থিক ক্ষতি সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরা হবে। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের অনুবাদ অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে রয়েছে: ৩(ঘ)-অ: আইন বা প্রথা অনুসারে বা কোন আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে সকল আর্থিক সুবিধা, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকারী তা হতে তাকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান; ৩(ঘ)-আ: সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে নির্তব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রদান না করা ; ৩(ঘ)-ই "বিবাহের সময় প্রাপ্ত উপহার বা স্ত্রীর বা অন্য কোন দান বা উপহার হিসাবে প্রাপ্ত কোন সম্পদ হতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান ত(খ)ঈ) "সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মালিকানাধীন যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তার অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা বা উহার উপর তার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান ৩(খ)-এ) "পারিবারিক সম্পর্কের কারণে যে সকল সম্পদ বা সুযোগ সুবিধাদিতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ব্যবহার বা ভোগদখলের অধিকার রয়েছে তা হতে তাকে বঞ্চিত করা বা তার উপর বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান।

[১৩৭] বিবাহ চলাকালীন সময়ে দম্পত্তিতে অর্জিত যৌথ সম্পত্তি বা তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ণয় এবং বিভাজনে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এটাকে "সমষ্টিগত সম্পত্তি বলা হয়। যেখানে ধরেই নেওয়া হয় যে, বিবাহ চলাকালীন সময়ে অর্জিত সকল সম্পত্তিতেই স্বামী-স্ত্রীর যৌথ মালিকানা রয়েছে। "সমষ্টিগত সম্পত্তির পদ্ধতিতে সাধারণত বিবাহ পূর্বের উত্তরাধিকার বা উপহারসূত্রে কোন উপায়ে অর্জিত সম্পত্তিকে পৃর্থক ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধরা হয়। কিছু কিছু দেশে "সমষ্টিগত সম্পত্তি এবং "পৃথক সম্পত্তি" দুইটা পদ্ধতিই রয়েছে এবং এখানে দম্পত্তিদেরকে বিয়ের সময়ই তারা কোন পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে সেটা নির্ধারণ করার অনুমতি দেয়। কিছু কিছু দেশে পৃথক সম্পত্তি পদ্ধতি আছে কিন্তু তার যৌথ প্রয়াস এবং যৌথ অংশীদারীত্বের মাধ্যমে অর্জিত দাম্পত্য সম্পত্তির স্বীকৃতি দেয় এবং সেই সম্পত্তির বিভাজন ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের কতটুকু অবদান রয়েছে সেটা বিবেচনা করে কিছু জায়গায় যেম ফিলিফাইন এবং ইন্ডিয়ার গোয়া রাজ্যতে সম্পূর্ণ সমষ্টিগত সম্পত্তির পদ্ধতি যেখানে সকল সম্পত্তির যৌথ সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে তা সে বিয়ের আগে বা বিবাহ চলাকালীন সময়, যখনই অর্জিত হোক না কেন।

সেটা কোন বিষয়ই নয়। কোন ব্যাপারই নয় তারা কতটা সাংসারিক ও পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করছেন। আইন এগুলির কোন কিছুই বিবেচনা করেনা। অনেক নারীই হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন, তারা বছরের পর বছর সংসারে শ্রম দেবার পরও তাদেরকে বৈবাহিক গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। শুধুমাত্র কিছু অলংকার আর ছোটখাটো জিনিজপত্রের বেশী কিছু সঙ্গে নিতে পারেননি।[১৩৮] অন্যান্য দেশ যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো এবং তুরস্ক তাদের আইন সংস্কার করেছে।[১৩৯] বিবাহিত নারীদের তালাক পরবর্তীতে বিবাহত্তোর সম্পত্তির অংশ প্রদানের মাধ্যমে যে সকল দেশে মুসলিম, হিন্দু ও খ্রীস্টান সকল সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং সে সকল

---

[১৩৮] ২৪ মে ২০১১ সালে মুসলিম নারী আসমার (ছদ্মনাম) সঙ্গে হিউম্যান রাইস ওয়াচের সাক্ষাৎকার। সঙ্গে হিউম্যান রাইস ওয়াচের সাক্ষাৎকার করে। কিভাবে স্বামীরা নারীদের হয়রানী করার জন্য চুরির মামলা দেয় যখন তারা শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তিগত সামগ্রী নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য "আইনী হয়রানী অধ্যায়টি দেখুন।

[১৩৯] মালেশিয়াতে ১৯৮৪ সালের ইসলামিক পারিবারিক আইনের (ফেডারেল টেরিটোরিজ) ৫৪ ধারা তালাকের সময় মুসলিম দম্পতিদের সম্পত্তি বন্টনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে। ৫৮ ধারা আদালতকে বিবাহকালীন সময়ে অর্জিত সম্পত্তি বা বিবাহপূর্ব অবস্থায় থাকা কোন পড়্ঠোর সম্পত্তি যেটির মূল্য পরবর্তীতে অন্যপড়্ঠা বা দুইপড়্ঠোর যৌথ প্রচেষ্টায় 'মোটামুটিভাবে বৃদ্ধি' পেয়েছে, সেসকল সম্পত্তি বন্টনের ড়্ঠামতা দেয়। এই সম্পত্তি বন্টনের সময় আদালত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করবেন যার মধ্যে রয়েছে "অর্থ, সম্পত্তি বা শ্রমের মাধ্যমে দেওয়া প্রত্যেক পড়্ঠোর অবদানের পরিমাণ", এবং এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই "আদালত পরিবারের সম্পত্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমবন্টনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন"। একই ধরনের বিধান রয়েছে মালেশিয়ান ল'রিফর্ম আইন (বিবাহ ও তালাক) ১৯৭৬ এর ৭৬ ধারায়, যেটি মালয়েশিয়ার অ-মুসলিমদের জন্য প্রজোয্য। দেখুন:
http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%204/Act%20164.pdf#http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.4/Act164.pdf# (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২)।

সিঙ্গাপুরে মুসলমান দম্পতিদের বৈবাহিক সম্পত্তি বন্টনের বিষয়টি ১৯৬৬ সালের এডমিনিস্ট্রেশন অব মুসলিম ল' এ্যাক্ট (২০০৯ সালের অক্টোবরে সংশোধিত) অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

দেখুন: http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%223e90fc65-b364-434b-b2dc-ced1d9608640%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0 (সর্বশেষ দেখা ৫ জুন ২০১২)।
তিউনিশিয়াতে ১৯৯৮ সালের ৯৮-৯১ নং আইন 'লজ অন দি রিজিম অফ কমিউনিটি অফ প্রপার্টি বিটুইন স্পাউজেস' - এর অনুচ্ছেদ ১ স্বামী-স্ত্রীকে বিবাহের সময় বা বিবাহ পরবর্তীতে কোন একটি গোষ্ঠীগত সম্পত্তির ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার দেয়।

দেখুন: http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/csp/biens1000.htm# (সর্বশেষ দেখা ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২।

মরক্কোতে 'দি মরোক্কান ফ্যামিলি কোড (মৌদাওয়ানা) ২০০৪' -এর ৪৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী দুই পড়্ঠাই পৃথক পৃথক সম্পত্তির মালিক, তবে তারা বিবাহিত অবস্থায় অর্জিত সম্পত্তির বন্টন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটা আলাদা চুক্তি করে নিতে পারেন। এ ধরনের কোন চুক্তি না থাকলে সম্পত্তি বন্টনের সিদ্ধান্তের ড়্ঠেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনতে হবে - "স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের শ্রম, পারিবারিক সম্পত্তির উন্নয়নে উভয় পড়্ঠোর নিবেদিত কর্মপ্রচেষ্টা ও দায়-দায়িত্ব" ইত্যাদি, দেখুন: http://www.hrea.org/moudawana.html#24 (সর্বশেষ দেখা ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২)।

ইন্দোনেশিয়াতে ১৯৭৪ সালের বিবাহ আইন (১নং আইন) এর অনুচ্ছেদ ৩৫ অনুসারে বৈবাহিক সম্পত্তির বিষয়াদি পরিচালিত হয়। ৩৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিবাহের সময় অর্জিত সম্পত্তির মালিকানা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের। তবে স্বামী বা স্ত্রীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি কিংবা তাদের মধ্যে কেউ যদি উপহার হিসেবে কোন সম্পত্তি পেয়ে থাকেন সেগুলি সংশিস্নষ্ট পড়্ঠোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি না তারা সেসব সম্পত্তির বিষয়ে অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেন।

দেখুন: http://sdm.ugm.ac.id/main/sites/sdm.ugm.ac.id/arsip/peraturan/UU_1_1974.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ১৪ ডিসেম্বর ২০১১)।

তুরস্কে দেওয়ানী কার্যবিধি ২০০১ এর অনুচ্ছেদ ১৮৬-২৩৭, পৃষ্ঠা ১৭৩ (উইমেন লিভিং আন্ডার মুসলিম লজ্ পুস্তকে "Knowing Our Rights: Women, family laws and customs in the Muslim World, 2006 শিরোনামে যেভাবে উলেস্নখিত আছে) অনুযায়ী বৈবাহিক সম্পত্তি বন্টনের বিষয়গুলি পরিচালিত হয়।

দেখুন:http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/import/english/pubs/pdf/knowing%20our%20rights/kor_2006_en.pdf (সর্বশেষ দেখা ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২)।

ফিলিপাইনের মুসলমানদের বৈবাহিক সম্পত্তির বিষয় সংক্রান্ত আইনের জন্য দেখুন - দি কোড অফ মুসলিম পারসোনাল ল'জ অফ দি ফিলিপিন্স, প্রেসিডেন্সিয়াল ডিক্রি নং- ১০৮৩ এর অনুচ্ছেদ ১৪, ৩৭ এবং ৩৮। অনুচ্ছেদ ১৪ তে বলা হয়েছে, বিবাহ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সময় একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পত্তি সংক্রান্ত সম্পর্ক কেমন হবে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ৩৭ এ বলা হয়েছে ষ্টবাহিক সম্পত্তি প্রথমত বিবাহের চুক্তি দ্বারা, তারপর আইনের বিধান অনুসারে এবং তারপরে প্রথা দ্বারা পরিচালিত হবে। অনুচ্ছেদ ৩৮ এ বলা হয়েছে, বিবাহ চুক্তির অবর্তমানে স্বামী-স্ত্রী ফিলিপাইনের ইসলামিক আইন ও দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসরণ করা ছাড়াও বৈবাহিক সম্পত্তিকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনার নীতি মেনে চলবেন। দেখুন:
http://www.chanrobles.com/presidentialdecreen01083.htm (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ৫ জুন ২০১২)। ফিলিপাইনের অ-মুসলিমরা ১৯৮৭ সালের ফিলিপিন্স পারিবারিক আইন দ্বারা পরিচালিত হবেন,

দেখুন: http://www.chanrobles.com/executiveorderno209.htm (সর্বশেষ দেখা ২২ মে ২০১২)। একই সাথে দেখুন ফিলিপিন্সের দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯৫০, http://www.chanrobles.com/civilcodeofthephilippinesfulltext.html (সর্বশেষ দেখা ৫ জুন ২০১২)।

দেশের আইন ধর্মীয় আইনের আইনী বৈধতা রয়েছে সে সকল দেশের বিবাহত্তোর সম্পত্তি আইন রয়েছে।[১৪০] বাংলাদেশে বিবাহিত দম্পতিরা যৌথ নামে সম্পত্তি কিনতে পারে যেমন জমির বা বাড়ির দলিল দুজনের নামে রাখা, কোন রকম আইনী অনুমোদন ছাড়াই পারিবারিক সম্পত্তির যৌথ অংশীদার হতে পারেন। নারীদের নামে খুব কম সম্পত্তির মালিকানা থাকার পরেও কিছু দম্পতি এই ধরনের পদক্ষেপ নেন। যখন তারা এটা করে, এটি দুইজনকেই এক ধরনের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দেয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দুইজন বিধবার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যাদের বিবাহত্তোর সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানা ছিল, যেটা তাদের স্বামীর মুত্যুর পর এই সম্পত্তি রাখতে এবং ভাড়া দেবার ক্ষমতা দিয়েছে।[১৪১] আরেকজন নারী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন, তিনি এবং তার স্বামী যৌথভাবে একটা জমি কিনেছিলেন এবং জমির দলিলে দুইজনের নামই দেয়। যেটা পরবর্তীতে যখন তার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে তখন সেই জমিতে তার ৩ সন্ত্মান ও বিধবা মায়ের জন্য একটা বাড়ী বানানোর অধিকার দেয়।[১৪২] দেখা যায় যে, বিবাহত্তোর সম্পত্তি সংক্রান্ত্ম আইন প্রণয়নে ধর্মীয় বাধাটা মূল বাধা নয়। যেমনটি রয়েছে ব্যক্তিগত আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে। রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে আসে, যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। বরঞ্চ এটা সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব।

পারিবারিক আইনের সংস্কার

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪০ বছর পর অত্যন্ত্ম গুরন্নত্বপূর্ণ কিছু আইন সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যার মধ্যে কিছু হচ্ছে নারীদের অধিকার রক্ষায় বিশেষত পরিবারের ভেতরে নারীদের প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে।[১৪৩] কিন্তু যখনই বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক এবং বিচ্ছেদ পরবর্তী অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়গুলি আসে, সেইখানে খুব কম পরিবর্তনই এসেছে। বৃটিশ আমল থেকে চলে আসা সংকলিত এবং অসংকলিত ব্যক্তিগত আইন, এমনকি কিছু আইন ১৮৬০ সালেরও। সমাজে ও পারিবারিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসা সত্বেও এগুলিকে স্পর্শ করা হয়নি। স্বাধীনতার পর একটা উলেস্নখযোগ্য সংস্কার হলো ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন। যদিও এই সংস্কার বিবাহিত এবং তালাকপ্রাপ্ত দম্পতির অধিকারে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন করেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের আরেকটি উলেস্নখযোগ্য সংস্কার হল ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ। এই সংস্কার নারীদের পড়্রো আইনী প্রতিকারের জন্য অন্ত্মতপড়্রো পারিবারিক আদালত ও প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে অতিরিক্ত কোন সংস্কার ছাড়াই বিদ্যমান পারিবারিক আইনের বাস্ত্মবায়ন করা হচ্ছে।[১৪৪]

বৈষম্যমূলক বিদ্যমান অবস্থাটি সমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বলে পারিবারিক আইনগুলির সংস্কার হচ্ছেনা, এই যুক্তিটি ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে অনেক নারী অধিকার কর্মী, এনজিও এবং ব্যক্তিবর্গ

---

[১৪০] পূর্বোক্ত।

[১৪১] ১৮ মে ২০১১ তারিখে ঢাকায় মুসলিম নারী শাহনাজ (ছদ্মনাম) এবং হিন্দু নারী মীনার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাড়্গাৎকার।

[১৪২] ১৯ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে মুসলিম নারী নাফিসার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাড়্গাৎকার।

[১৪৩] উদাহরণস্বরূপ দেখুন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০।

[১৪৪] পারবারিক আদালত বিষয়ে বিস্ত্মারিত তথ্যের জন্য পরবর্তীতে আলোচিত "আইনী প্রতিবন্ধকতা" অধ্যায়টি দেখুন।

সংস্কারের কথা বলে আসছেন। কেউ কেউ দীর্ঘ সময় ধরে একটা ধর্মনিরপেক্ষ অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের কথা বলে আসছেন যা সকল ধর্মের জন্য প্রযোজ্য হবে।[১৪৫] সাম্প্রতিককালে ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্নভাবে আইনী সংস্কারের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। সংস্কারের যে কোন পদ্ধতিই বাংলাদেশের পারিবারিক আইনগুলোকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনগুলির সাথে একই কাতারে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এই সংস্কারগুলি উত্তপ্ত রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিবেশের কাছে হার মেনে এক অচলায়তনের মধ্যে আটকে আছে।

সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য একটি সমন্বিত ব্যক্তিগত আইন প্রনয়ণের প্রস্তাবটি খুব কম জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বাংলাদেশ আইন কমিশন ২০০৫ সালে ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড এর প্রস্তাবনা বিবেচনা করে দেখেন এবং কোন ধরনের গবেষণা বা সামাজিক চাহিদা কিংবা পৃথিবীর অন্য দেশের সংবিধান সংশোধনীর উদাহরণ বিবেচনা না করেই দ্রুত সেটিকে প্রত্যাখ্যান করে।[১৪৬] সম্প্রতি নারীদের কিছু সংগঠন ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোডের দাবী প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে। কিন্তু আইন প্রণেতা বা কর্মকর্তাদের এই বিষয়টা বিবেচনা করার কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা।

বর্তমান সময়ে বরং পারিবারিক আইন সংস্কারের বিষয়টি বেশী লক্ষণীয়। ২০১২ সালে বাংলাদেশ আইন কমিশন মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পারিবারিক আইনে অনুসৃত বিবাহ এবং তালাকের বিষয়গুলি নিয়ে একটি গবেষণা শেষ করার পর সেসব আইন সংস্কারের জন্য সুপারিশ করেছে।[১৪৭] খ্রিস্টান পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে, কমিশনের রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এর ২০০৬ সালের সুপারিশগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং কমিশন তালাকের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করাসহ স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্মতিকে তালাকের ভিত্তি হিসেবে আইনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।[১৪৮] অনুরূপভাবে, হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে কমিশন বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করাসহ হিন্দু দম্পতিদের বিবাহ বিচ্ছেদে অনুমোদন দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে।[১৪৯]

---

[১৪৫] একটি অভিন্ন পারিবারিক আইনের দাবিতে নারী অধিকার আন্দোলনের যে ইতিহাস সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন পেরেরার লেখা 'দি ফ্রাক্চারড স্কেলস'।

[১৪৬] বাংলাদেশ আইন কমিশনের প্রতিবেদন "Report on a reference by the government towards the possibility of framing out of a uniform family code for all communities of Bangladesh relating to marriage, divorce, guardianship, inheritance etc,Ó ১৮ জুলাই ২০০৫,

দেখুন: http://www.lawcommissionbangladesh.org/reports/69.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ৩০ মার্চ ২০১১)। ঢাকায় ৩ অক্টোবর ২০১১ বাংলাদেশ আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ড: শাহ্ আলম-এর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[১৪৭] ১২ আগষ্ট ২০১২ তারিখ যুগ্ম জেলা জজ্ এবং বাংলাদেশ আইন কমিশনের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার শারমিন নিগারের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ই-মেইল যোগাযোগ। তিনি জানান যে, মুসলিম পারিবারিক আইন সংস্কারের বিষয়ে কমিশনের রিপোর্ট তখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে খ্রিস্টান এবং হিন্দু পারিবারিক আইনের সংস্কার সম্পর্কিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।

[১৪৮] বাংলাদেশ আইন কমিশনের প্রতিবেদন "Final Report on the Law Commission's Recommendations for the Amendment of the Divorce Act of 1869 (Divorce of Christian Couples) and Enactment of a New Law on Adoption by the Christians," ‡`Lyb: http://www.lawcommissionbangladesh.org/reports.htm (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২৬ জুন ২০১২)।

[১৪৯] "হিন্দু পারিবারিক আইনের সংস্কারের জন্য পেশকৃত সুপারিশমালা সম্পর্কে বাংলাদেশ আইন কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন", আগষ্ট ২০১২। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কাছে এর কপি রয়েছে। যুগ্ম জেলা জজ্ এবং বাংলাদেশ আইন কমিশনের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার শারমিন নিগারের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ই-মেইল যোগাযোগ, ১২ আগষ্ট ২০১২।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)'র অর্থায়ন নিয়ে আইন কমিশনের গবেষণাগুলিতে সহায়তা দিচ্ছে।[১৫০] একইভাবে এপ্রিল ২০১২ সালে একটি বেসরকারি সংস্থা সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এডভান্সড লিগ্যাল এন্ড হিউম্যান রাইটস স্টাডিজ (সেইলস) মুসলমান, হিন্দু এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পারিবারিক আইন সংস্কারের পড়ো ৩টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।[১৫১]

প্রত্যেকটা ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে পারিবারিক আইন সংস্কারের প্রস্তাবক ও সমালোচক রয়েছেন। রক্ষণশীল ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতারা মুসলিম আইনের সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করেন। তারা দাবী করেন যে এটি শরীয়া আইনের ব্যাখ্যা থেকে পথভ্রষ্ট হবে।[১৫২] অন্যদিকে, অন্যান্য দেশ যাদের পারিবারিক আইন শরীয়া আইনকে অন্তর্ভুক্ত করে বা উলেস্নখযোগ্য মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে, তারা বৈষম্য দূর করা বা কমানোর জন্য তাদের আইন সংস্কার করেছে। যেমন, তিউনিশিয়া এবং তুরস্ক বহুবিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে এবং মরক্কোর মতো দেশ বহুবিবাহ রোধ করার জন্য খুবই শক্ত প্রক্রিয়া শুরন্ন করেছে।[১৫৩] মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, তিউনিশিয়া, মরক্কো এবং তুরস্ক সব দেশেই তালাক পরবর্তী বৈবাহিক সম্পত্তি বন্টনের বিধান রয়েছে।[১৫৪] হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যক্তিগত আইন ও সংকলন সংস্কার নিয়ে আলোচনা চালু রয়েছে, কিন্তু উলেস্নখযোগ্য বাধাও রয়েছে। ২০১১ সালে নারীকর্মী এবং ধর্মীয় নেতারা বাংলাদেশের ভেতর আঞ্চলিক পরামর্শ সভার আয়োজন করে যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু পারিবারিক আইন বিশেষত বিবাহ এবং তালাক বিষয়ে একটি খসড়া আইন তৈরী করা।[১৫৫] হিন্দু বিবাহ আইন প্রণয়নে নারী জোট নামে একটি সংগঠন ৩০০০ কেস স্টাডি সংগ্রহ করে যাতে দেখানো হয়েছে হিন্দু নারীরা বৈষম্যপূর্ণ ব্যক্তিগত আইনের কারণে কিভাবে দূর্দশার শিকার হচ্ছেন।[১৫৬] এই আলোচনার ফল হিসেবে এই জোট শুধুমাত্র বিবাহ নিবন্ধন আইনই নয় বিবাহ এবং তালাকের ক্ষেত্রে

---

[১৫০] পূর্বোক্ত। আরো দেখুন- ৯ এপ্রিল ২০১২ তারিখে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি-র দোয়েল মুখার্জীর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ইমেইল যোগাযোগ। ইউএনডিপি সমর্থিত প্রমোটিং একসেস টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পে সহায়তার অংশ হিসেবে এই তহবিল দেওয়া হচ্ছে।

[১৫১] নওরিন তামান্না এবং অন্যান্য, মুসলিম উইমেনস রাইটস আন্ডার বাংলাদেশ ল: প্রভিশনস, পলিসিজ এন্ড প্র্যাকটিসেস রিলেটেড টু কাসটুডি এন্ড গার্ডিয়ানশিপ (ঢাকা: সেইলস, ২০১২); ড. শাহনাজ হুদা, কমব্যাটিং জেন্ডার ইনজাস্টিস: হিন্দু ল ইন বাংলাদেশ (ঢাকা: সেইলস, ২০১২); ড. ফস্টিনা পেরেরা, সিভিল ল'জ গভার্নিং খ্রিশ্চিয়ানস ইন বাংলাদেশ: এ প্রপোজাল ফর রিফর্ম (ঢাকা: সেইলস, ২০১২)।

[১৫২] মার্চ, মে ও জুন ২০১১ সালে ঢাকাতে অধিকার কর্মী ও আইনজীবীদের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার। উদাহরণস্বরূপ, মার্চ ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেন। যদিও এই নীতিতে পারিবারিক আইনের কোন পরিবর্তন করা হয়নি তথাপি এই নীতির ভুল ব্যখ্যা দিয়ে রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতারা ব্যাপক প্রতিবাদে নামে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, "বাংলাদেশ প্রটেষ্ট এগেইন্সট উইমেন'স রাইটস লেফ্‌ট ওয়ান ডেড," বিবিসি নিউজ, ৩ এপ্রিল ২০১১, http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12950866 (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২২মে ২০১২)।

[১৫৩] মরোক্ক দুইটি ক্ষেত্রে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে। মরোক্কান পারিবারিক বিধি (মুদাওয়ানা) ২০০৪ -এর ৪০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "যেসব ক্ষেত্রে স্ত্রীদের প্রতি অসম আচরণের ভয় রয়েছে সেখানে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। যেখানে বিবাহের চুক্তিতে স্ত্রীর শর্ত রয়েছে যে স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবেনা সেখানেও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। অনুচ্ছেদ ৪০ ও ৪১ এ বলা হয়েছে যেখানে বিবাহের চুক্তিতে স্ত্রী স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে কোন শর্ত স্থাপন করেনি সেখানে স্বামীকে আদালতের নিকট অনুমোদনের জন্য 'ব্যতিক্রমী ও বাস্তবসম্মত কারণ দর্শিয়ে' তার চূড়ান্ত বক্তব্য সহকারে আবেদন করতে হবে। দেখুন: http://www.hrea.org/moudawana.html#24 (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২)। তিউনিশিয়ার পারিবারিক আইন ১৯৫৬ এর অনুচ্ছেদ ১৮ তে বলা হয়েছে "তিউনিশিয়া বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে এবং যে ব্যাক্তি একজন স্ত্রীর বর্তমানে পুনরায় বিবাহ করে তার এক বছরের কারাদ- হবে বা ২৪০,০০০ ফ্রাঙ্কস (এখন ২৪০ তিউনিশিয়ান দিনার বা ১৪৯ ইউএস ডলার) জরিমানা দিতে হবে অথবা দুটো শাস্তিই একসাথে ভোগ করতে হবে।" দেখুন:http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/codes_juridiques/Statut_personel_Fr.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ৫ জুন ২০১২)। Women Living under Muslim Law, "Knowing Our Rights: Women, family laws and customs in the Muslim World," পৃষ্ঠা ১৯৭। তুরস্ক ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে।

[১৫৪] অন্যান্য দেশের আইন বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য"বিবাহত্তোর সম্পত্তি আইনের অভাব" শীর্ষক উপরোক্ত অধ্যায়টি দেখুন।

[১৫৫] ১ জুন ২০১১ সালে ঢাকাতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক (অধিকার) রীনা রায় এর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৫৬] ড. শাহনাজ হুদা, কমব্যাটিং জেন্ডার ইনজাসটিস: হিন্দু ল ইন বাংলাদেশ(ঢাকা:সেইলস, ২০১২) পৃ ৪৫।

সমান অধিকার দাবী করেছে। কিছু হিন্দু নেতারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন বিবাহ নিবন্ধন আইনের অভাবে শুধুমাত্র পারিবারিক আদালতে বিবাহ প্রমানে অসুবিধা হচ্ছে না, আরো অনেক বাস্তব সমস্যা যেমন বিদেশ যাতায়াতের জন্য কাগজপত্র তৈরি করা ইত্যাদি অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়।[১৫৭] যাইহোক না কেন কিছু রক্ষণশীল হিন্দু নেতা এবং সংগঠন ব্যক্তিগত আইন সংস্কারের বিরোধিতা করে যাচ্ছেন। কারণ হিসাবে যেটা বলা হয় তা হলো বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু প্রান্তিকীকরণ এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অধিকার বঞ্চনার অতীত ইতিহাস। অন্যারা বাংলাদেশের "অপির্ত সম্পত্তি" আইনের ইতিহাস তুলে আনেন। যেটা সরকারকে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি নিয়ে যেতে দিয়েছে এবং সম্পত্তি বিষয়ে নতুন কোন আইন হলেই একটা সন্দেহের তৈরী হয়।[১৫৮] কিন্তু ২০১১ সালে সরকার অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যবর্তনের একটি আইন করেছে, যেটাকে হিন্দু নেতারা সঠিক পথ বলে মনে করছেন। সবশেষে মে ২০১২ সালে বাংলাদেশ মন্ত্রী পরিষদ অনেক প্রতিবাদের মুখে হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ ঐচ্ছিক নিবন্ধীকরণের একটা খসড়া আইন অনুমোদন করেছেন।[১৫৯] যদিও সরকারের এই উদ্যোগটি স্বাগত জানাবার মতো এটা অনেক নারী কর্মীদের সংস্কারের দাবীর তুলনায় খুবই সীমিত। খ্রীস্টান সাম্প্রদায়ের একটা অংশও ব্যক্তিগত আইনের সংস্কারের বিষয় নিয়ে বির্তক করছে। ২০০২ সালে জাতীয় চার্চ পরিষদ ক্যাথলিক বিশপ ও খ্রীস্টান ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে ব্যক্তিগত আইন সংস্কারের বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেন।[১৬০] ২০১০ সালে বাংলাদেশ খ্রীস্টান আইনজীবী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটার একটা অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত আইনের সংস্কার।[১৬১]

---

[১৫৭] ৩ অক্টোবর ২০১১ সালে ঢাকাতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৫৮] ২০০১ সালের আইনটি এই সকল সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য একটা প্রক্রিয়ার কথা বলেছিল কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। দেখুন- আবুল বরকাত ও অন্যান্য, ডিপ্রাইভেশন অফ হিন্দু মাইনোরিটি ইন বাংলাদেশ, লিভিং উইথ ভেস্টেড প্রপার্টি(ঢাকা: পাঠক সমাবেশ ২০০৮) ; ৩ অক্টোবর ২০১১ সালে ঢাকাতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।১৯৭২ অর্পিত সম্পত্তি অধ্যাদেশ এবং ১৯৭৬ সালের XCIII অধ্যাদেশে বলা হয়েছে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় যারা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেশ থেকে পালিয়েছে সরকার তাদের সম্পত্তি নিয়ে নিতে পারে। যদিও ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন আইন বলা হয়েছে সরকার তালিকভূক্ত " প্রত্যর্পনযোগ্য" সম্পত্তিসমূহ তাদের মালিক বা ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে ফেরত দিবে, সরকার এখনও প্রত্যর্পনযোগ্য সম্পত্তির চূড়ান্ত তালিক প্রকাশ এবং তা প্রত্যর্পন করেনি।

[১৫৯] "ঢাকা ফর হিন্দু ম্যারেজ ল", দি হিন্দু, মে ২২, ২০১২, http://www.thehindu.com/news/international/article3443443.ece (সর্বশেষ দেখা ২২ মে ২০১২); "Registration Optional for Hindu Marriage," May 21, 2012, http://www.thedailystar.net/newDesign/latest_news.php?nid=37859 (সর্বশেষ দেখা ২২ মে ২০১২)।

[১৬০] ফস্টিনা পেরেরা, " এ প্রপোজাল টু রিফর্ম দি সিভিল ল'জ পারটেইনিং টু খ্রিশ্চিয়ানস ইন বাংলাদেশ ,"জুন ২০১১।

[১৬১] পূর্বোক্ত।

৩. বিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত এবং পৃথক বসবাসকারী নারীদের উপর বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইনের প্রভাব

বিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত এবং পৃথকবসবাসরত নারীদের ওপর বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইনের অনেক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। ব্যক্তিগত আইন পুরুষের ওপর নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং পারিবারিক নির্যাতনের ঝুঁকি বাড়ায়। এগুলি বাংলাদেশে নারী প্রধান পরিবারের মধ্যে উচ্চ হারে দারিদ্রতা তৈরীতে সহায়তা করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নেওয়া সাক্ষাৎকারে নারীরা বলেছেন, কিভাবে এই ব্যক্তিগত আইনের নিম্ন শ্রেণীর অধিকার তাদের দূর্দশাকে বৃদ্ধি করেছে। তারা বর্ণনা করেছেন যে, তারা নির্যাতিত বিবাহিত জীবনের মধ্যে পড়ে আছে কারণ তারা ভয় পান যে, তালাক বা বিচ্ছেদ হলে সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি তাদের কোথাও কোন যাবার জায়গা নাই। ভরণপোষণ এর নিশ্চয়তা খুবই কম। বেশীরভাগ নারীই যারা তালাকপ্রাপ্ত বা পৃথক বসবাস করছেন তারা তাদের অর্থনৈতিক কষ্টের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। যেটার মধ্যে রয়েছে ঘর হারানো, রাস্তায় বাস করা যেমন তাদের যাবার কোন জায়গা নেই, খাবারের জন্য ভিক্ষা করা, সন্তানদের স্কুলে থেকে সরিয়ে কাজে দেওয়া, অসুস্থতা এবং এসমস্ত অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য অর্থের অভাব। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে কিভাবে ব্যক্তিগত আইনের মাধ্যমে নারীরা এবং তাদের ওপর নির্ভরশীলরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বাংলাদেশের বিয়ের উচ্চহার সত্বেও ৩,৩০,০০০ তালাকপ্রাপ্ত নারী[১৬২] এবং অসংখ্য পৃথক বসবাসরত নারীরা নানারকম সমস্যার জর্জরিত।

পারিবারিক নির্যাতন

বৈবাহিক জীবনে এবং তালাক পরবর্তীতে বিবাহত্তোর সম্পত্তিতে নারীর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে পারিবারিক আইনের ব্যর্থতা এবং ভরণপোষনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা পারিবারিক নির্যাতন থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।[১৬৩] যেটা বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশী বিবাহিত নারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২০১০ সালের পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন এই ফাঁকটা কিছুটা পূরণ করেছে। এই আইনে পারিবারিক নির্যাতন হিসেবে সে সকল কার্যকে বোঝায় যা "অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ"। এগুলির মধ্যে রয়েছে সেই ধরনের বিষয় যেখানে স্বামী তার স্ত্রীকে সম্পত্তি ব্যবহার ও পরিচালনা হতে দূরে রাখে

---

[১৬২] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, "পপুলেশন টেন ইয়ারস এন্ড ওভার বাই এজ গ্রুপ, সেক্স এন্ড ম্যারিটাল স্ট্যাটাস" স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক অফ বাংলাদেশ (ঢাকা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১০)পৃ-৪৫।

[১৬৩] ১৯ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির প্রোগ্রাম ম্যানেজার (পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ) মিতালী জাহান; ১৯ মে ২০১১ সালে আইন ও সালিশকেন্দ্রের সিনিয়র উপ-পরিচালক, মেডিয়েশন ও র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট, নীনা গোস্বামী ; ২৯ মার্চ ২০১১ তারিখ ঢাকাতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আয়েশা খানম ও মাকসুদা আক্তার এর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার; ৩০ মার্চ ২০১১ সালে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি পরিষদের নির্বাহী পরিচালক সালমা আলী, পরিচালক (লিগাল এইড) রেহানা সুলতানা, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ) মিতালী জাহান, বিথিকা হাসান, সমন্বয়কারী, চাইল্ড প্রোটেকশন এন্ড এন্টি ট্রাফিকিং প্রোগ্রাম, মশিউর আলম, সহকারী প্রোগ্রাম ম্যানেজার , এডভোকেসী এন্ড রিসার্চ ইউনিট এর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দলীয় আলোচনা। আরো দেখুন, রাবেয়া ভূইয়া, জেন্ডার এন্ড ট্রাডিশন ইন ম্যারেজ এন্ড ডিভোর্স (ঢাকা: ইউনেস্কো, ২০১০) পৃ ২৫৫।

যে সম্পত্তির অধিকারী সে পারিবারিক সম্পর্কের কারনেই, তার দৈনন্দিন চাহিদাকে অস্বীকার করে এবং বিয়ের সময় উপহার হিসেবে যা পেয়েছে তা ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করে।[১৬৪]

২০০৭ সালের ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভেতে দেখা যায় যে, ৫৩ শতাংশ বিবাহিত নারী তাদের স্বামীর দ্বারা যৌন ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন।[১৬৫] ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের বিবাহিত নারীদের ৫ জনে একজন বৈবাহিক যৌন নির্যাতনের শিকার হন।[১৬৬] নারীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেন তারা মাসের পর মাস এবং অনেক সময় বছরের পর বছর পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করে যাচ্ছে কারন তারা জানে যে যদি তারা তালাক দেয় বা পৃথক থাকে তাহলে তাদের ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় পড়তে হবে। যেমন ফরিদা বলেছে, তার স্বামী এবং স্বামীর প্রথম স্ত্রী তাকে মারত, না খাইয়ে রাখত এবং গালিগালাজ করত। সে বলে প্রথম স্ত্রী আমার সাথে দুর্ব্যবহার করত কিন্তু আমি কিছু বলতে পারতাম না। আমার বাবা-মা দরিদ্র এবং তারা আমাকে সাহায্য করতে পারবেনা। আমার স্বামীও আমাকে খারাপভাবে দেখত। কোন কোন দিন তারা আমাকে খেতে দিত না। গালিগালাজ ও মারধর করতো। আমার কোথাও যাবার জায়গা নাই। তারা যাই করন্নক আমাকে তাদের সঙ্গে থাকতে হয়।[১৬৭] শেফালী তার স্বামী এবং স্বামীর পরিবারের কাছ থেকে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে বছরে পর বছর পার করেছে। কিন্তু চলে যেতে পারেনি কারণ তার নিজেকে চালানোর মত কোন সামর্থ্য নাই। সে যখন সন্ত্মানসম্ভবা এবং স্বামীর ২য় স্ত্রী গ্রহণের পরিকল্পনার প্রতিবাদ করে তখন থেকে নির্যাতন শুরন্ন হয়। সে বলেছে যে "সে আমর বুকে লাথি মারে এবং চুপ থাকতে বলে তা না হলে বেশী মারবে। এটা ছিল শীতকালে এবং খুব ঠান্ডা ছিল। সে আমাকে বাধ্য করে শরীর থেকে সমস্ত্ম কাপড় খুলে ফেলতে এবং বিছানার পাশে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে। সে ঘরের ভেতরে একটা রেকর্ডার বাজিয়ে রাখত যাতে কেউ কিছু শুনতে না পারে। আমি বিছানার পাশে সারারাত দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং যদিওবা একটু নড়াচড়া করেছি, সে আমাকে লাথি মারতো এবং আরো বেশী করে মারত।[১৬৮] একদিন শেফালীর স্বামী তাকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে। যেহেতু শেফালীর বাবা মা তাকে সাহায্য করতে পারবে না তাই শেফালীর স্বামীর সঙ্গেই থাকতে হচ্ছে। স্বামী পরবর্তীতে তাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাকে শশুড়বাড়ীর লোকজন নির্যাতন চালিয়ে যায়।[১৬৯]

অর্থনৈতিক ক্ষতি

তালাকপ্রাপ্ত এবং পৃথক বসবাসরাত নারীরা অর্থনৈতিকভাবে সংগ্রাম করে চলে এবং এখানে কোন সন্দেহ নাই যে, বিবাহত্তোর সম্পত্তিতে নারীদের অংশ দেবার ব্যক্তিগত আইনের ব্যর্থতা এবং

---

[১৬৪] পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, ধারা ৩।

[১৬৫] নিপোর্ট (NIPORT) এবং অন্যান্য, বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০০৭, পৃ-২০১।

[১৬৬] পূর্বোক্ত, পৃ-২০২।

[১৬৭] ২২ মে ২০১১ তারিখ নোয়াখালীতে মুসলিম নারী ফরিদার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৬৮] ১৯ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে মুসলিম নারী শেফালির (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার। অন্যান্য নারীরাও একই ধরনের পারিবারিক নির্যাতনের কথা বর্ননা করেছেন। ১৮ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে মুসলিম নারী তৃষ্ণা (ছদ্মনাম), ১৯ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে মুসলিম নারী শর্মিলা (ছদ্মনাম), ১৯ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে মুসলিম নারী মনিরা (ছদ্মনাম); এবং ২০ মে ২০১১ তারিখ নোয়াখালীতে মুসলিম নারী আখতারার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৬৯] পূর্বোক্ত।

ভরণপোষনের কঠোর বিধি তাদের দুর্দশায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে জাতিসংঘের দেশীয় দল দারিদ্রতা একটা মূল কারণ হিসাবে উলেখ করেছেন এবং নারী প্রধান পরিবারের দারিদ্রতার মূল কারণ হিসেবে বৈবাহিক অস্থিতিশীলতাকে দেখিয়েছেন এবং নারী প্রধান পরিবারের দারিদ্র্যকে চরম ও মাত্রাতিরিক্ত বলেছেন।[১৭০] বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করেছে যে, 'নারীরা যখন তাদের পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষটিকে পরিত্যক্ত হওয়া, তালাক বা মৃত্যুর কারণে হারান, সেই নারীদের দরিদ্র হবার প্রবণতা বেশী।[১৭১]

বাংলাদেশে ১৩ শতাংশ পরিবার নারী প্রধান।[১৭২] নারীপ্রধান পরিবারের অর্থনৈতিক দারিদ্রতার সীমা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য রয়েছে। ২০০৫ সালের মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের ৪৯ শতাংশ নারী প্রধান পরিবার দরিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করছেন, পুরুষ প্রধান পরিবার সেক্ষেত্রে যেটা ৩৯ শতাংশ।[১৭৩] ২০০৫ সালের জাতিসংঘের অন্য একটি প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে শতকরা ৯৫ ভাগ নারী প্রধান পরিবার দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করছেন।[১৭৪] ২০০৯ সালের মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল এর উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যদিও সর্বপরি দেশের দারিদ্রতার সীমা কমেছে, নারী প্রধান পরিবারের জীবন মাত্রার মানের খুবই কম উন্নয়ন হয়েছে।[১৭৫] এটাতে কোন অনুমিত দারিদ্র সীমা দেখানো হয়নি।[১৭৬] বাংলাদেশে পারিবারিক আয় ও ব্যায়ের জরিপে একটা ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। তারা দেখেছে যে নারী প্রধান পরিবারে আয়ের দারিদ্রতা প্রতিবছরই হ্রাস পাচ্ছে। এই জরিপে দেখানো হয়েছে যে, ২০০০ সালে অনুমানিক ৩৫. ১ শতাংশ নারী প্রধান পরিবার দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করত, তা পুরুষের ক্ষেত্রে ছিল ৩৪.২ শতাংশ। কিন্তু ২০১০ সালের জরিপে দেখানো হয়েছে যে, যেখানে ১৪.৬ শতাংশ নারী প্রধান পরিবার দরিদ্র সেখানে ১৭.৯ শতাংশ পুরুষ প্রধান পরিবার দরিদ্র। বিশেষজ্ঞরা এই অনুমিত হ্রাসের ব্যাপারে ভিন্নতাকে বলেছেন নারী প্রধান পরিবার আলাদা না করতে পারার সমস্যা, এই অনুমানে সেই সকল পরিবারকে ধরা হয়েছে যাদের স্বামীরা বিদেশে থাকে এবং বাড়ীতে টাকা পাঠাচ্ছে।[১৭৭]

---

[১৭০] ইউএন এর বাংলাদেশ কান্ট্রি টিম, "ইউনাটেড নেশনশ কমন কান্ট্রি এসেসমেন্ট অফ বাংলাদেশ,২০০৫" প্যারা ২.১.৪। http://www.undp.org/asia/country_programme/CCA/CCA-Bangladesh2005.pdf (সর্বশেষ দেখা ২০ জুন ২০১১)।

[১৭১] পরিকল্পনা কমিশন, ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা, পৃ-১৫৩।

[১৭২] নিপোর্ট (NIPORT) এবং অন্যান্য, বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০০৭, পৃ-১৪। এর মধ্যে *"de facto"* ও *"de jure"* দুই ধরণের নারীপ্রধান পরিবারই রয়েছে।

[১৭৩] বাংলাদেশ সরকার ও ইউএন এর কান্ট্রি টিম, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রতিবেদন" ২০০৫ http://www.undp.org.bd/mdgs/Bangladesh%20MDGProgress%20Report%202005%20-%202.pdf (সর্বশেষ দেখা ১৮ জুলাই ২০১১), পৃ ২২। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উন্নয়ন প্রতিবেদন নারীপ্রধান পরিবারের মধ্যে দারিদ্য বিষয়ে কোন ধারাবাহিক তথ্য প্রকাশ করেনি। ২০০৬,২০০৭ ও ২০০৯ সালের উন্নয়ন প্রতিবেদনে নারীপ্রধান পরিবারের মধ্যে দারিদ্র্য বিষয়ে কোন তথ্যই নাই।

[১৭৪] ইউএন এর বাংলাদেশ কান্ট্রি টীম, "ইউনাটেড নেশনশ কমন কান্ট্রি এসেসমেন্ট" প্যারা ২.১.৪।

[১৭৫] বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর "দি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস, বাংলাদেশ প্রগ্রেস রিপোর্ট ২০০৯, http://www.undp.org.bd/info/pub/Bangladesh%20MDGs%20Progress%20Report%202009.pdf (সর্বশেষ দেখা ১৮ জুলাই ২০১১) পৃ-৪৪।

[১৭৬] ২০১১ সালের সর্বশেষ এমডিজি উন্নয়ন প্রতিবেদন পুরুষপ্রধান পরিবারের তুলনায় নারীপ্রধান পরিবারের মধ্যে দারিদ্রতা বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট তথ্য সংযোজন করেনি কিন্তু বলা হয়েছে যে নারীপ্রধান পরিবার বেশী খাদ্য অনিরাপত্তায় রয়েছেন।

[১৭৭] ১০ জুন ২০১২ তারিখ রুরাল এমপাওয়ারমেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এসেটস (REOPA) এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার গোরান জনসনের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

বাসস্থান

তালাকপ্রাপ্ত ও বিচ্ছেদ হওয়া নারীদের বাসস্থানটা প্রায়শই প্রধান সমস্যা। যেহেতু বাড়ীর মালিকানা বেশীর ভাগ সময়ই পুরন্নষের নামে এবং ব্যক্তিগত আইন তালাকের পর নারীদের বিবাহত্তোর সম্পত্তির কোন অধিকার দেয়না, পুরন্নষ চেষ্টা করে বাড়ীটা তাদের দখলে রাখতে এবং নারীরা তাদের নিজের মত চলে যায়। অনেকেরই পরিবার বা বন্ধু রয়েছেন যারা সাহায্য করতে পারেন যদিও বা প্রায়শই বিরক্ত হন এবং অন্যারা রাস্ত্মায় গিয়ে পড়েন যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা কোন সহযোগিতা পান। কোহিনুর তার স্বামীর থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন তার স্বামী তাকে নির্যাতন করে দ্বিতীয় বিয়ে করে। তার ব্বৈবাহিক ঘর থেকে চলে আসা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিলনা। তার নতুন ঘর নিয়ে টাকা পরিশোধের কোন অবস্থা নাই সুতরাং তাকে এবং তার কন্যাকে তার পিতার পরিবারে ফিরে আসতে হয়। সে বলেছে "আমার বাবা আমাকে বলেছে- তুমি আমার মেয়ে তাই মেয়েকে তো আমাদের খাওয়াতেই হবে। কিন্তু আমি কেন তোমার মেয়েদের খাওয়াবো? তারাতো আমার দায়িত্ব নয়। তিনি আমাকে আমার মেয়েদের দায়িত্ব নিতে বললেন বা তাদের ছেড়ে আসতে বললেন।[১৭৮]

অন্যান্য নারীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন তালাক বা বিচ্ছেদের পর ঘরছাড়া হয়ে তারা আশ্রয় খুজেছেন বন্ধু, প্রতিবেশী বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। জয়া তার স্বামীর ঘর থেকে অনেকবারই শ্বাশুড়ী ও স্বামীর অসহণীয় নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে পালিয়ে এসেছেন। প্রথম কয়েকবার পালিয়ে গিয়ে একটি স্থানীয় চার্চে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীতে সে বাবামার কাছে থাকার জন্য যায় কিন্তু প্রতিবারই তাকে স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্য প্রতিবেশীরা চাপ দেয়। স্বামী তার উপর অত্যাচার করে এবং সে পালিয়ে এক পারিবারিক বন্ধুর কাছে আশ্রয় নেয়। জয়া বলেছে "খালার স্বামী আমি ওই বাড়ীতে থাকি তা চায়নি, সূতরাং আমি ওই বাড়ীর বারান্দায় ১০-১২ দিন থাকি। আমার ঠান্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে যাই। তখন শীতকাল, তাই আমি আমাকে ওখান থেকে নিয়ে একটি অব্যবহৃত বাথরুমে নিয়ে রাখা হয়। ওনাদের ২টা বাথরন্নম ছিল। আমি এভাবে প্রায় ১ মাস থাকি। আমি বাথরুমে থেকে তখন বের হতাম তখন খালার স্বামী কাজে বাইরে যেতেন। একদিন আমি ধরা পড়লাম এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া লাগল, খালা আমার জন্য ঝগড়া করেছিল।"[১৭৯] কিছু নারী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন তারা বিচ্ছেদ বা তালাক পরবর্তীতে ঘরছাড়া হয়ে কাজের বুয়ার কাজ নিয়েছে, তাতে করে মাথার ওপর ছাদ থাকে।[১৮০] যেমন- তাবাসসুম, সে যখন স্বামীর দ্বারা পরিত্যাক্ত হন তখন তার ছোট বোনের বাচ্চার দেখাশোনার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব নেন যখন তার বোন চাকরীতে যেত। তাবাসুম এর স্বামী তাদের বৈবাহিক বাড়ীতেই থাকে এবং তাবাসুম কোন ভরণপোষন বা বৈবাহিক সম্পত্তির কোন অংশই পায়নি।[১৮১] কিছু নারী বিচ্ছেদ ও তালাক পরবর্তীতে নিজেদের গৃহহীন এবং রাস্ত্মায় দেখতে পান। সায়রা ৩০ বছর বয়সে দুই সন্ত্মানের মা।

---

[১৭৮] ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুরে মুসলিম নারী কেহিনুরের (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৭৯] ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ ঢাকাতে খ্রিস্টান নারী জয়ার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৮০] ১৬ মে ২০১১ সালে আইন ও সালিশকেন্দ্রের সালমা জেবীন; ১৯মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি পরিষদের প্রোগ্রাম ম্যানেজার (পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ) মিতালী জাহান; ২৪ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিচালক(লিগাল এইড) রেহানা সুলতানার সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার। ২২ মে ২০১১ তারিখ নোয়াখালীতে হামিদার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৮১] ৪ জুন ২০১১ তারিখ গাজীপুরে মুসলিম নারী তাবাসসুমের (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

বছরের পর বছর পারিবারিক নির্যাতনের কারণে স্বামী থেকে বিচ্ছেদে আছেন। তার স্বামী বৈবাহিক বাড়ীতে আছেন এবং সে দুই সন্তান ও কিছু ব্যক্তিগত সামগ্রীসহ পালিয়ে আসে। তার পরিবার কিছুদনি তাকে রাখে কিন্তু পরে চলে যাবার জন্য চাপ দেয়। তিনি বলেন আমার বাবা ও ভাই আমাকে খাবার দিতে চাইতো না, আমি ফিরে এসেছি এতে তারা খুব ক্ষিপ্ত এবং আমাকে আবার বিয়ে করতে বলেন। আমি বিয়ে করতে চাইনি তাই বাচ্চাদের নিয়ে চলে আসি। আমি সন্তানদের নিয়ে একটা বড় গাছের নীচে থেকেছি এবং খাবার জন্য ভিক্ষা করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা স্থানীয় সংস্থা আমার সহযোগীতা করেছে।[১৮২] চলিস্নশোর্ধ আছিমাও তার বৈবাহিক গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। তার স্বামী শ্বশুর বাড়ীতে থাকত এবং যখন তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে তখন তার শ্বশুরবাড়ীর লোকজন আছিমাকে বের করে দেয়। কোন ভরণপোষণ বা বিবাহত্তোর অধিকার না পেয়ে আছিমা তার ১০ বছরের মেয়েকে গৃহশ্রমিকের কাজ দিয়ে অন্য একটিা পরিবারে পাঠায়। আছিমা ও তার ছোট মেয়ে রাস্তায় থাকে যতদিন না একজন গৃহকর্তা তাদের থাকার জায়গা দেয় এই শর্তে যে তারা তার জমিতে বিনা মজুরীতে কাজ করবে।[১৮৩] কিছু নারী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছে যে, তালাক বা বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে তারা তাদের বৈবাহিক গৃহ রাখতে পেরেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও পর্যন্ত আর্থিক কষ্টে রয়েছেন। ভরণপোষণের বিষয়টি নিশ্চিত না করে শুধুমাত্র ঘর রেখে দেওয়া হয়তো নারীদের দরিদ্রতা থেকে রেহাই দেবেনা। ৩৫ বছরের রোখসানা, স্বামী তাকে পরিত্যাগ করার পরও সেই বাড়ীতে রয়ে যায়। কিন্তু তার দ্বারা বাসা ভাড়া, সংসারের খরচ এবং দুইটা সন্তানের দেখাশোনা করা অসম্ভব ছিল। সে গার্মেন্টসে চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত ঋণ নিয়ে চলে কিন্তু এখনও পর্যন্ত সব প্রয়োজন মেটানো তার জন্য কষ্টকর।[১৮৪]

খাদ্য

বাংলাদেশে অনেক তালাকপ্রাপ্ত এবং পৃথক বসবাসরত নারীদের জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা একটি অত্যন্ত দুঃসাধ্য বিষয়। বিবাহত্তোর সম্পত্তি বন্টন এবং ভরণপোষণ নিশ্চিতকরণের আইনী প্রতিকারের অভাব এই ক্ষুধার চাহিদা বৃদ্ধিতে আরো সহায়তা করে। ২০০২ সালের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, পুরম্নষ প্রধান পরিবারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক নারী প্রধান পরিবারের দিনে মাত্র দুই বেলা খাবার জোটে।[১৮৫] ডবিস্নউ এফ পি'র তালিকায় মোটামুটিভাবে ৩৮ শতাংশ নারী প্রধান পরিবারকে "খাদ্য

---

[১৮২] ২০ মে ২০১১ তারিখ নোয়াখালীতে মুসলিম নারী সায়রার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৮৩]২০ মে ২০১১ তারিখ নোয়াখালীতে মুসলিম নারী আছিমার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার। অন্যান্য নারীরাও একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ননা করেছেন। যেমন- ২০ মে ২০১১ তারিখ নোয়াখালীতে মুসলিম নারী জোবাইদা (ছদ্দনাম), ২০ মে ২০১১ তারিখ নোয়াখালীতে মুসলিম নারী ফাতিমা (ছদ্মনাম); এবং ২১ মে ২০১১ তারিখ নোয়াখালীতে মুসলিম নারী শিরিনের (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৮৪] ২৭ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে মুসলিম নারী রোখসানার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার। আরো দেখুন ২৭ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে গোপীবাগ লিগাল এইড ক্লিনিকের সমন্বয়কারী মাসুদা রেহানা বেগমের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৮৫] ৫ মে ২০১২ তারিখ ঢাকাস্থ দা ইউনাইটেড নেশনশ ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রমের ভালনারিবিলিটি এনালাইসিস এন্ড ম্যাপিং (ভিএএম) ইউনিটের প্রধান নুসা ইয়ামিনা চৌধুরির সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ইমেইল যোগাযোগ। ৩০ এপ্রিল ২০১২ তারিখ ইউনাইটেড নেশনশ ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রমের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিষ্টা রাডারের নিকট হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নারী প্রধান পরিবারের মধ্যে খাদ্য অ-নিরাপত্তার সর্বশেষ তথ্য বিষয়ে একটি চিঠির উত্তরে, মিজ. চৌধুরি লেখেন, "৫.৬% পুরষ-প্রধান পরিবারের বিপরীতে ১১% নারী-প্রধান পরিবার দিনে দুই-বেলা খাবার পান। ২৬% পুরষ-প্রধান পরিবারের বিপরীতে ৩৮% নারী-প্রধান পরিবার খাদ্য অ-নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে। "অভিযোজন কৌশলের খতিয়ানে ১৩% পুরষ-প্রধান পরিবারের বিপরীতে ২৩% নারী-প্রধান পরিবার রয়েছেন"। আর অভিযোজন কৌশলের খতিয়ানে উচ্চ অবস্থান উচ্চ খাদ্য অ-নিরাপত্তা নির্দেশ করে।

নিরাপত্তাহীন"[১৮৬] হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে সাধারণ পরিবারের ক্ষেত্রে এই হার ২৩ শতাংশ।[১৮৭]

অনেক নারীই হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন তারা তালাক ও বিচ্ছেদের পর তাদের এবং সন্তানদের খাদ্যের জন্য সংগ্রাম করেছেন। যেমন ৩০ বছর বয়সী দুই সন্তানের জননী সিতারা বলেছেন " যখন তার স্বামী তাকে তালাক দিল তখন ঢাকার শহরের সে তার খাবার এবং বাড়ী ভাড়া জোগাড় করতে পারেনি। "আমার আয় ২০০০ টাকা এর মধ্যে ঘর ভাড়া ১৩০০ টাকা, বাচ্চাদের খরচ ৫০০ টাকা দেবার পর আমার কাছে খাবারের জন্য কোন টাকা থাকেনা।" সে বলে "আমি মানুষের বাড়িতে কাজ করি এবং তাদের কাছে খাবার ভিক্ষা চাই এবং সেগুলি বাসী খাবার নিয়ে আসি বাচ্চাদের জন্য। আমি আমার কাপড়ও কিনতে পারি না। আমি আমার চাকুরীদাতাদের বলি আমাকে তাদের পুরাতন কাপড় দিতে পরার জন্য। সিতারা তার ছেঁড়া শাড়ি টেনে ধরে এই কথাগুলি বলে।[১৮৮] একই ভাবে পঞ্চাশোর্ধ মেহেবুবা বলে তার স্বামী তাকে ছেড়ে যাবার পর প্রায়ই তার খাবার টাকা থাকে না। "আমি যাদের বাড়ীতে কাজ করি তাদের বাড়ি থেকে বাসী পান্তা ভাত খাই।[১৮৯]

স্বাস্থ্য

বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইনগুলি তালাকপ্রাপ্ত এবং বিচ্ছেদে থাকা নারী এবং তাদের নির্ভরশীলদের খারাপ স্বাস্থ্যের ঝুকিতে ফেলে। ভরণপোষণ নিশ্চিতকরণ এবং বিবাহত্তোর সম্পত্তি বন্টনে আইনের অভাব নারীদেরকে প্রায়ই দারিদ্রতার মধ্যে ফেলে দেয় যেটা স্বাস্থ্য খারাপে প্রভাব ফেলে এবং স্বাস্থ্যসেবা পেতে বাধা তৈরী করে। নারী প্রধান পরিবারের সন্তানদের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যসেবা পাবার সুযোগের বিষয়ে গবেষণায় একটা লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যেমন ২০০১ সালের একটি গষেণায় দেখা যায় যে, গবষেণার এলাকাগুলিতে তালাকপ্রাপ্ত নারীদের শিশু মৃত্যুর হার বিবাহিত মায়ের শিশু মৃত্যুর সংখ্যা থেকে দ্বিগুণ।[১৯০] ২০০০ সালের একটি দেখা গেছে যে, পুরুষ প্রধান পরিবারে ৬৫% অসুস্থ বাচ্চার স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ রয়েছে, অন্যদিকে নারী প্রধান পরিবারের শতকরা ৪৪ শতাংশ অসুস্থ বাচ্চার স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ পায়।[১৯১] অনেক তালাকপ্রাপ্ত এবং পৃথকবসবাসরত নারী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন তাদের স্বাস্থ্য সেবা নেবার মত কোন টাকাই নেই বা খুবই সীমিত আছে। যে কারণে তাদের অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পায়। যেমন ৩০ বছর বয়সী মোনা বলেছে, যখন তার পেটের বাচ্চাটি নষ্ট হয়ে যায়

---

[১৮৬] পূর্বোক্ত।

[১৮৭] পূর্বোক্ত।

[১৮৮] ২৪ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে মুসলিম নারী সিতারার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৮৯] ২৪ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে মুসলিম নারী মেহবুবার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৯০] এন আলম ও অন্যান্য, "দি ইফেক্ট অফ ডিভোর্স অন ইনফ্যান্ট মর্টালিটি ইন এ রিমোর্ট এরিয়া অফ বাংলাদেশ," জার্নাল অফ বায়ো সোসাল সাইন্স, ভলিউম ৩৩, ২০১১, পৃ ২৭১। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ এর করা এই গবেষণাটিতে তালাকের পর, তালাকের ১২ মাসের মধ্যে বা তালাকের ১২ মাসের পূর্বে জন্য নেওয়া শিশুদের উপর করা হয়েছে।

[১৯১] এম এ মান্নান, "ফিমেল হেডেড হাউজহোল্ড ইন রুররাল বাংলাদেশ: স্ট্র্যাটিজি ফর ওয়েল বিং এন্ড সারভাইবাল," পেপার ১০: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এনড ইউএনএফপিএ, ২০০০, http://www.cpd-bangladesh.org/publications/cpdunfpa/unfpa10.pdf (সর্বশেষ দেখা ১৭ জানুয়ারী ২০১১) পৃ-১১। ইউএন পপুলেমন ফান্ড এবং স্থানীয় একটি NGO সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এই গবেষণাটি করেছে।

তখন তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে এবং তাকে পরিত্যাগ করে। কোন উপার্জন ও ভরণপোষণ ছাড়াই মোনা তার বৈবাহিক গৃহ ছাড়তে বাধ্য হয় এবং তার মায়ের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। মোনা বলে "আমার বাচ্চটা নষ্ট হবার পর আমার ঔষধ দরকার ছিলো, আমি সেই খরচ বহন করতে পারিনি। আমার মায়ের কোন সামর্থ নাই যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তাই আমি কোন ঔষধ কিনতে পারিনি। আমার খুব ব্যাথা হত এবং দীর্ঘদিন দূর্বল ছিলাম।"[১৯২]

শিশুশ্রম ও শিশুদের শিক্ষা

বাংলাদেশের বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইনের অর্থনৈতিক খেসারত হিসেবে অনেক তালাকপ্রাপ্ত এবং পৃথক বসবাসকৃত নারীরা তাদের সন্তানদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে কাজে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারী প্রধান পরিবারের সন্তানদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সংখ্যা অনেক বেশী এবং এসব পরিবারের মধ্যে কিছু পরিবার তালাক বা বিচ্ছেদের কারনে নারী প্রধান। ২০০৯ সালের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রার বাংলাদেশ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে শতকরা ৮৮ শতাংশ নারী প্রধান পরিবার বলেছে তাদের সন্তানেরা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে।[১৯৩] অনেক তালাকপ্রাপ্ত ও পৃথক বসবাস করা নারীরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলেছেন যখন বৈবাহিক গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় তারা তাদের কন্যা সন্তানদের স্কুল থেকে নিয়ে এসে মানুষের বাসায় গৃহশ্রমিকের কাজে পাঠান। এদের মধ্যে একজন হল জেমা, যাকে তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করার পর তার মা ও ছোটবোনসহ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন সে স্কুল ছেড়ে চলে আসে। কোন ভরণপোষণ বা বিবাহোত্তর সম্পত্তি না পেয়ে তার মা তাদেরকে চালাতে পারছিল না বা স্কুলেও পাঠাতে পারছিল না। জেমা গার্মেন্টসে কাজ শুরন্ন করে এবং তার মা ও ছোটবোন ঢাকায় দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গৃহশ্রমিকের কাজ নেয়।[১৯৪]

---

[১৯২] ৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখ ঢাকাতে খ্রিস্টান নারী মোনার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার। একজন আইনজীবী হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকারে তার একটি মামলার কথা বলেন যেখানে একজন নারীর দুইবার গর্ভপাত হবার পরিত্যাক্তা হন যখন তার চিকিৎসার খরচের জন্য খুবই সামান্য টাকা ছিল। ৪ অক্টোবর ২০১১ তারিখ ঢাকাতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিটিগেশন ইউনিটের প্রধান, আইনজীবী মাকসুদা আক্তারের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[১৯৩] বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০০৯" পৃ-৫৯।

[১৯৪] ২২ মে ২০১১ তারিখ নোয়াখালীতে মুসলিম নারী জেমার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

৪. আইনী প্রতিবন্ধকতা

ব্যক্তিগত আইনের দেওয়া এই সীমিত অধিকার নারীরা যখন প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন তখন প্রায়ই তারা পদ্ধতিগত ও বিভিন্ন ধরনের বাস্তব বাধার সম্মুখীন হন। যেগুলি আইনী প্রতিকার পাওয়ার পথে দীর্ঘসূত্রিতা ও বাধার সৃষ্টি করে। যেখানে বিবাহত্তোর সম্পত্তিতে কোন অধিকার বা দাবীই নাই এবং মোহর ও ভরণপোষণের সীমিত অধিকার রয়েছে, সেখানে তালাকপ্রাপ্ত ও পৃথক বসবাসরত নারীদের আইনী দাবীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশা খুব কম। যেহেতু এদেশে দরিদ্রতার হার খুব প্রকট বিশেষত নারী প্রধান পরিবারে, সেক্ষেত্রে সমঝোতা বা আদালতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রতিকার অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। দুঃখজনকভাবে বিচ্ছেদ ও তালাকের পর আইনী দাবী আদায়ের প্রক্রিয়া নানা সমস্যায় পরিপূর্ণ যা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক নারীরাই প্রথম পর্যায়ে সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠদের মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিক সালিশের মাধ্যমে মোহর বা ভরণপোষন আদায়ের চেষ্টা করেন। এই প্রক্রিয়ার কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে, যেমন এটি অনানুষ্ঠানিক, বাড়ীর কাছে এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য। যদিও এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক দিক রয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠরা কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলতে বাধ্য নন এবং আইনী জায়গাগুলোতেও দূর্বলতা রয়েছে। সরকার থেকে কোন তদারকি নেই এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা (সাধারণত পুরুষ) প্রায়শই নারীদের এই প্রক্রিয়ায় পূর্ণ অংশগ্রহণ থেকে দূরে রাখেন। ব্যক্তিগত আইনের বিষয়গুলি সমাধানের জন্য বাংলাদেশে পারিবারিক আদালত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কিন্তু মোহর বা ভরণপোষনের জন্য যে সকল নারীরা আদালতে যান তারা অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হন। কিছু বিষয় দ্রুত ও কার্যকর পদ্ধতিতে পারিবারিক আদালতে মামলা পরিচালনা করার ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। অন্য বিষয়গুলি হলো অস্পষ্ট আইন বিশেষত ভরনপোষনের আদেশ দেবার ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রগুলি রয়েছে। অনেকগুলি আছে পদ্ধতিগত যেমন কার্যকর সমন পদ্ধতি, তথ্য প্রমাণের শক্ত এবং অবাস্তব বাধ্যবাধকতা এবং আদালতের রায় বাস্তবায়নে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা। মোহর ও ভরণপোষন আদায়ের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং সময় নষ্ট করার জন্য পুরুষরা প্রায়ই পাল্টা মামলা যেমন দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধার বা চুরির অভিযোগে ফৌজদারী মামলা দায়ের করে থাকেন। এগুলি তালাকপ্রাপ্ত এবং পৃথক বাস করা নারীদের ন্যায় বিচার পাওয়ার পথে আরেকটি বড় বাধা। দেওয়ানী আদালত পদ্ধতি সংস্কারের মাধ্যমে মোহর ও ভরণপোষন আদায়ের ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার কিছু সম্ভাবনা রয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২০১১ সালে পদ্ধতিগত সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে যেটা এখনও চলমান।[১৯৫] কিন্তু উন্নত পদ্ধতি চালু করলেও বাংলাদেশের নারীরা অর্থনৈতিক প্রতিকারের জন্য আদালতে যেয়ে অনেক ঝুকির সম্মুখীন হবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত মৌলিক আইন এবং ন্যায় বিচার পদ্ধতির আরো সংস্কার না হয়।

---

[১৯৫] ২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ ঢাকাস্থ জাতিসঙ্ঘ উন্নয়ন তহবিলের দোয়েল মুখার্জীর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ই-মেইল যোগাযোগ।

অনানুষ্ঠানিক সমঝোতা বা সালিশ

অনেক এলাকায় বিশেষত গ্রাম এলাকায় নারীরা তাদের মোহর ও ভরণপোষণের দাবী আদায়ের জন্য গ্রাম বা সমাজের মুরন্নব্বীদের কাছে অনানুষ্ঠানিক সালিশের জন্য যায়। অনানুষ্ঠানিকভাবে বিবাদ নিষ্পত্তির মাধ্যমে হয়ত সময় এবং টাকা (যাতায়ত ভাতা ও কোর্ট ফি) বাঁচানো সম্ভব। কিন্তু নারীদের জন্য ব্যক্তিগত আইনের দাবী আদায়ে একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি থেকে এটা এখনও অনেক দূরে। হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ এরকম অনেক নারীর সাক্ষাতকার নিয়েছে যারা সমাজের নেতা এবং আইনজীবীদের সহযোগিতার মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক সালিশ পদ্ধতিতে তাদের মোহর ও ভরণপোষন আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছেন।[১৯৬] তারা ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা বনর্ণা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতায় খুশি এবং সালিশকারীরা তাদের মোহর ও ভরণপোষণ আদায় করে দিয়েছেন। কিন্তু অনেক নারী এবং কর্মীরা বলেছেন যে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরন্নষরা সালিশে নারীদের কথা বলতে দিতে চান না। তারা তাদের সিদ্ধান্ত্মটা অপর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিয়ে থাকেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মামলা/ সালিশ পরিচালনা বাবদ পাওনা টাকা থেকে একটা অংশ চেয়ে থাকেন। মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের এক কর্মী বলেছেন তিনি অনেক নারীকেই অনানুষ্ঠানিক সালিশে সহযোগিতা করেছেন এবং দেখেছেন যে সব সালিশই সমাজের পুরন্নষ নেতাদের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। তিনি এই সালিশকাররা খুব কমই নারীদের খোলামনে কথা বলার সুযোগ দেন যার ফলে তারা আংশিক ঘটনার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত্ম নেন। "গ্রামের মুরন্নব্বীরা এমনকি ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ করেন নারীদের সাথে কথা না বলে। তারা কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেন না। গ্রামের মুরন্নব্বীরা নারীটিকে বলেন- তুমি ভেতরে যাও এবং বস। যদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও উপস্থিত থাকেন তিনি কোন হস্ত্মক্ষেপ করেন না বা বলেন না যে নারীদের এখানে উপস্থিত থাকা বা কথা বলা দরকার।"[১৯৭] যদিও ধরা হয় যে অনানুষ্ঠানিক সালিশ আদালতের তুলনায় কম ব্যয় সাপেক্ষ কিন্তু আইনজীবীরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলেছেন গ্রামীণ মুরন্নব্বীরা সালিশের মাধ্যমে যে টাকা উদ্ধার করেন তার একটা অংশ সালিশের খরচের কথা বলে নিজেদের পকেটে রেখে দেন।[১৯৮] একটা ঘটনায় গ্রামের মুরন্নব্বীরা মোহর ও ভরণপোষন বাবদ স্ত্রীকে একলক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা প্রদানের জন্য স্বামীকে নির্দেশ দেন। কিন্তু নারীটি পেয়েছে একলক্ষ দশ হাজার টাকা বাকী টাকাটা মুরন্নব্বীরা রেখে দেন।[১৯৯] আইনজীবী ও নারীরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে

---

[১৯৬] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অপ্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা বা সালিশ বিষয়ে বিস্ত্মারিত অনুসন্ধান করেনি কারণ এই বিষয়ের অনেক বিস্ত্মারিত তথ্যবলী সংরক্ষিত আছে। যেমন দেখুন-দেখুন কুমার কুন্ডু, "আন্ডারস্ট্যান্ডিং অলটারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন ফর দি রন্নরাল উইম্যান ইন বাংলাদেশ: সাম ইলাস্ট্রেশন ফ্রম ব্র্যাক এইচ আর এল এস প্রোগ্রামস, ওয়ার্কিং পেপার নম্বর ১৩, অক্টোবর ২০১০, http://www.bracresearch.org/workingpapers/red_wp13_new.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ২২ মে ২০১১)।

[১৯৭] ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুরে মাদারীপুর লিগাল এইড এসেসিয়েশনের কর্মী নমিতা রানী দত্তের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার। অন্যান্য কর্মীরাও একই ধরনের উদ্বেগের কথা বর্ননা করেছেন। ২৫ মে ২০১১ সালে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সিনিয়র উপ-পরিচালক, মেডিয়েশন ও র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট, নীনা গোস্বামীর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাথে সাক্ষাৎকার।

[১৯৮] ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুরে মাদারীপুর লিগাল এইড এসেসিয়েশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী হুমায়ুন লস্করের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার। অন্যান্য কর্মীরাও একই ধরনের উদ্বেগের কথা বর্ননা করেছেন। ২৫ মে ২০১১ সালে আইন ও সালিশকেন্দ্রের সিনিয়র উপ-পরিচালক, মেডিয়েশন ও র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট, নীনা গোস্বামীর সাথে হিউম্যান রাইট ওয়াচের সাথে সাক্ষাৎকার।

[১৯৯] ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুরে মাদারীপুর লিগাল এইড এসেসিয়েশনের কর্মী নমিতা রানী দত্তের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার। অন্যান্য কর্মী ও নারীরাও একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বরেছেন। ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুরে মাদারীপুর লিগাল এইড এসেসিয়েশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী হুমায়ুন লস্করের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার; ২৫ মে ২০১১ সালে আইন ও সালিশকেন্দ্রের সিনিয়র উপ-পরিচালক, মেডিয়েশন ও র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট, নীনা গোস্বামীর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাথে সাক্ষাৎকার; ২৫ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ লিগাল এইড ও সার্ভিসেস ট্রাস্টের ফরিদা ইয়াসমিন,

বলেছেন সরকারের তদারকীর অভাব এবং সালিশ নিয়ন্ত্রণবিধির অভাব নারীদেরকে শুধু ক্ষতিই করছে না এগুলি আইনসম্মতও নয়। শেফালী বলেছেন যখন তার স্বামী তাকে গর্ভবতী অবস্থায় মারধর করেছে তখন গ্রামের মুরুব্বীরা তার বাবাকে যৌতুকের বাকী টাকাটা স্বামীকে দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে, যদিও যৌতুক নেয়া বেআইনী করা হয়েছে একদশকেরও বেশি সময় ধরে।[২০০] বাংলাদেশের আইনে এই অনানুষ্ঠানিক সালিশের কোন স্বীকৃতি নাই এবং এধরনের সালিশের সিদ্ধান্তগুলির কোন মূল্যায়ন বা আপীল গ্রহণ করা হয় না।[২০১] শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী সংস্থাগুলি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে এই পদ্ধতিগুলির তদারকি ও পর্যালোচনা করা হয়। যাতে করে সালিশীতে নারীদের আইনী অধিকার অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[২০২] স্থানীয় সংস্থাগুলি নিজেরাও তাদের আইনজীবীদের মাধ্যমে এই ধরনের পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিশের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে থাকেন যাতে করে মামলা মোকদ্দমার মাধ্যমে আদালতের সময় ও টাকার অপচয় না হয়।[২০৩]

আদালতে যত লড়াই

> যখন সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল তখন সে কিছুই দেয়নি, এমনকি একটা কাপড়ের টুকরাও নয়। আমি খাবারের জন্য ভিক্ষা করেছি। যখন আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি আদালতে যাব তখন সে বলেছিল- আদালতে যাও তুমি কিছুই পাবে না। কখন আমি আদালত থেকে কিছু পাবো?
>
> ৩সিতারা (ছদ্মনাম), মুসলিম, ঢাকা, মে ২০১১।

আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থায় বাংলাদেশে পারিবারিক আদালতই মোহর ও ভরনপোষন আদায়ের প্রধান ক্ষেত্র।[২০৪] ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত এই আদালতগুলি[২০৫] প্রতিটি জেলার নিম্ন আদালতের সাথে সংযুক্ত। কিছু কিছু পারিবারিক আদালতের বিচারকরা শুধুমাত্র পারিবারিক

উপ-পরিচালক (আইন), এম ডি বরকত আলী, সহ-পরিচালক (আইন) এবং তাপসী রাবেয়া, সহকারী সমন্বয়কারী (সালিস) এর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দলীয় সাক্ষাতকার।

[২০০] ১৯ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে মুসলিম নারী শেফালীর (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[২০১] দেখুন বল্লাস্ট ও অনান্য বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য, ২০১০ সালের রীট পিটিশন নং ৭৫৪ এবং ৪২৭৫ তে আদালত রায় দিয়েছন যে সালিসের মাধ্যমে কোন বিচার বহির্ভূত শাস্তি দেওয়া যাবে না। http://www.blast.org.bd/content/judgement/ejp-judgment-8July2010.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ৩০ এপ্রিল ২০১২)। এই মামলা এবং সংশিষ্ট বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দেখুন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ৭ জুলাই ২০১১ তারিখের প্রেস বিজ্ঞপ্তি, "বাংলাদেশ: প্রোটেক্ট উইম্যান এগেইনষ্ট ফতোয়া ভায়োলেন্স" http://www.hrw.org/news/2011/07/06/bangladesh-protect-women-against-fatwa-violence (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ৩০ এপ্রিল ২০১২)।

[২০২] উদাহরণস্বরূপ দেখুন- দিনা সিদ্দিকী, "পেভিং দা ওয়ে টু জাসটিস: দা এক্সপেরিয়েন্স অফ নাগরিক উদ্যোগ" http://www.gadnetwork.org.uk/storage/29.%20Paving%20the%20Way%20to%20Justice.pdf (সর্বশেষ দেখা ৩০এপ্রিল ২০১২)।

[২০৩] মার্চ, মে, জুন ও অক্টোবর ২০১১ সালে ব্র্যাক-এইচ আর এল এস, বল্লাস্ট, বিএমপি, আসক এবং বিএনডবিল্লএলএ এর আইনজীবিদের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[২০৪] তত্ত্বগতভাবে একজন মুসলিম নারী তিনি যে এলাকায় বসবাস করেন সেই এলাকার স্থানীয় পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট তার ভরণপোষন আদায়ের জন্য আবেদন করতে পারেন। স্ত্রী তার এই ভরণপোষনের অধিকার প্রয়োগের জন্য স্থানীয় পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে পারেন যিনি বিষয়টা দেখার জন্য সালিসি পরিষদ গঠন করবেন। এই সালিসি পরিষদ স্বামীকে ভরণপোষন প্রদানের নির্দেশ দিয়ে সার্টিফিকেট বের করতে পারেন। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ৯। যাই হোক, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যে সকল নারীদের সাথে কথা করেছে তারা কেউই ভরণপোষন আদায়ের জন্য সালিসি পরিষদে যাননি, হয় তারা এই বিষয়টি জানতেন না বা সালিসি পরিষদের কোন কার্যক্রম বা অস্তিত্ব নাই।

[২০৫] পাবিারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, ধারা ৪।

বিষয়গুলি বিচার করেন এবং কেউ কেউ দেওয়ানী বিষয়গুলিও দেখেন। মোহর (মুসলিমদের জন্য) এবং ভরণপোষনসহ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই পারিবারিক আদালতে আবেদন করতে পারেন। বিচারকগণ মুসলিম, হিন্দু ও খ্রীস্টান আইনগুলি অনুসরণ করেন। তবে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ এবং দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী সকলের জন্য একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।[২০৬] পারিবারিক আদালত প্রক্রিয়ায় নারীদের মোহর ও ভরণপোষনের প্রকৃত সমাধান করা এখনও অনেক দূরের কাজ, যা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

পারিবারিক আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পারিবারিক আদালতের যে সকল প্রাক্তন বিচারক হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাথে কথা বলেছেন তারা জানিয়েছেন যে, পারিবারিক আদালতে নিয়মিতভাবে অসংখ্য মামলার জট লেগেই থাকে। একজন প্রাক্তন বিচারক বলেছেন, তিনি একটা জেলায় একসাথে সাতশ' পারিবারিক মামলা একা পরিচালনা করেছেন।[২০৭] আইনজীবীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন, যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি সেখানে পারিবারিক আদালতে মামলা সামলাতে হিমশিম খেতে হয়।[২০৮] যেমন ঢাকা শহরের কথা এক্ষেত্রে উলেস্নখ করা যেতে পারে। এখানে থানার সংখ্যা ৪৩টি আর পারিবারিক আদালতের সংখ্যা মাত্র ৩টি।[২০৯] পারিবারিক আদালত বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, যে জেলায় একজন বিচারক পারিবারিক ও দেওয়ানী মামলা দুটোই পরিচালনা করেন সেই জেলার অবস্থা আরও বেশি খারাপ।[২১০]

মামলার জট, পদ্ধতিগত জটিলতা (যা নীচে আলোচনা করা হয়েছে) তালাকপ্রাপ্ত ও বিচ্ছেদ হওয়া নারীদের আইনী প্রতিকার প্রাপ্তিকে অত্যন্ত কষ্টকর ও ধীরগতি সম্পন্ন করে ফেলে। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেনমোহর বা ভরণপোষণের পরিমাণ খুবই কম, তবুও অনেক নারীর জন্য সেটি অনেক গুরন্নত্বপূর্ণ, কারণ বিবাহ বিচ্ছেদের সাথে সাথে তারা সাধারণত গৃহহীন হয়ে পড়েন এবং সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য এই অর্থটা খুবই গুরন্নত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারা মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর পারিবারিক আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন না, যদিও বাস্তবে তাই করতে হয়।[২১১] কিছু কিছু মামলায় নারীরা অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় ধরে পারিবারিক আদালতের রায়ের কিংবা রায় বাস্তবায়নের

---

[২০৬] পূর্বোক্ত, ধারা ৫।

[২০৭] মে ও জুন ২০১১, পারিবারিক আদালতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের (অনুরোধে নাম ও বিস্তারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২০৮] ১৬ মে ২০১১ তারিখ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আইনজীবী সালমা জেবীন ও ফারহানা আফরোজের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার; ১ জুন ২০১১ তারিখ ঢাকাতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিটিগেশন ইউনিটের প্রধান, আইনজীবী মাকসুদা আক্তার; ২৫ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ- সার্ভিসেস ট্রাস্টের সহকারি পরিচালক (আইন) ফরিদা ইয়াসমিন এবং ২১ মে ২০১১ নোয়াখালীতে আইনজীবী আ ন ম আব্দুল রহমানের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২০৯] ১৬ মে ২০১১ তারিখ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আইনজীবী সালমা জেবীনের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[২১০] পারিবারিক আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের (অনুরোধে নাম ও বিস্তারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২১১] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর ধারা ১০, ১৩ ও ১৪। পারিবারিক আদালত প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা কমানোর জন্য, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ বিচার-পূর্ব ও বিচার পরবর্তী সালিসের মাধ্যমে পক্ষদ্বয়কে সমঝোতার চেষ্টার সুযোগ দেন। যেখানে উভয় পক্ষ সমঝোতায় পৌছায় সেখানে আদালত সমঝোতা ডিক্রি জারি করতে পারেন।

জন্য অপেক্ষা করেন।[২১২] বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের একজন আইনজীবী বলেছেন, তার একটি মামলায় পারিবারিক আদালত একজন নারীর মোহর ও ভরণপোষণের ডিক্রি বাস্ত্মবায়নের জন্য ১৮ বছর সময় নিয়েছেন।[২১৩] একইভাবে একজন প্রাক্তন বিচারক হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে একটি ভরণপোষণের মামলার কথা বলেছেন যেটার রায় দেওয়া হয়েছিল ১৯৮০-র দশকে, কিন্তু জুন ২০১১ পর্যন্ত্ম ঐ রায় তখনও বাস্ত্মবায়িত হয়নি। তিনি বলেন -

> ঐ স্বামী তার আইনজীবী এবং কোর্ট ফি বাবদ স্ত্রীর ভরণপোষণের টাকার পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি টাকা খরচ করেছেন। আর অন্যদিকে এই অসহায় দরিদ্র নারীটি গত ২০ বছরের বেশি সময় ধরে কিছুই পায়নি।[২১৪]

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক -এর হিউম্যান রাইটস এ- লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস বিভাগ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলার পারিবারিক আদালতে ভরণপোষণের মামলা পরিচালনা করছে। ১৯৯৮ সালে সংস্থাটি আইনী সহায়তা কার্যক্রম শুরম্ন করে। ঐ সময় থেকে ২০১২ সালের ৩১ মে পর্যন্ত্ম দেশের বিভিন্ন পারিবারিক আদালতে ভরণপোষণ সংক্রান্ত্ম তাদের যেসব মামলা ঝুলে আছে তার একটি হিসাব তারা নিয়েছেন এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাথে সেসব তথ্য বিনিময় করেছেন।[২১৫] পরিশিষ্ট - ২ তে উলেস্নখিত বিভিন্ন মামলার তথ্য থেকে ভরণপোষণ সংক্রান্ত্ম হাজার হাজার মামলায় পারিবারিক আদালতের দীর্ঘসূত্রিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যদিও ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ পারিবারিক আদালতকে অন্ত্মর্বর্তীকালীন ভরণপোষণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে যাতে করে কোন পক্ষ মামলার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে না পারে, কিন্তু বিচারকরা মোহর ও ভরণপোষণের মামলায় এধরনের অন্ত্মর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে নারীর পড়ো অর্থনৈতিক প্রতিকার বিধানের ক্ষমতা খুব কমই ব্যবহার করে থাকেন।[২১৬]

---

[২১২] ২৫ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ- সার্ভিসেস ট্রাস্টের সহকারি পরিচালক (আইন) এম. ডি. বরকত আলী; ২৪ মে ২০১১ বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির পরিচালক (লিগ্যাল এইড) রেহানা সুলতানা; ১৬ মে ২০১১ তারিখ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আইনজীবী সালমা জেবীন; এবং আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের (অনুরোধে নাম ও বিস্ত্মারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার। পারিবারিক আদালতে ভরণপোষণ মামলার তথ্য সম্পর্কে জানতে দেখুন পরিশিষ্ট - ২, যেগুলি ব্র্যাক হিউম্যান রাইটস এ- লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস কর্তৃক দেশের ৬১টি জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

[২১৩] ২৫ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ লিগাল এইড ও সার্ভিসেস ট্রাস্টের ফরিদা ইয়াসমীন, উপ-পরিচালক (আইন) এবং এম ডি বরকত আলী, সহকারী-পরিচালক (আইন) -এর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার; ২৯ ও ৩০ মে ২০১২ সালে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড ও সার্ভিসেস ট্রাস্টের ইনভেস্টিগেশন ও মনিটরিং সেলের সমন্বয়কারী আব্দুল মালেক -এর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ই-মেইল যোগাযোগ। জনাব মালেক বস্নাস্টের প্যানেল আইনজীবীদের দ্বারা দেশের বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত মামলার একটা তালিকা দেন যেগুলি ১০ বছর আগে শুরম্ন হয়েছে এবং এখনও চলছে। এর মধ্যে সিলেট জেলার ৭টি, ময়মনসিংহ জেলার ৩টি, খুলনা জেলার ২টি এবং রাজশাহী জেলার দু'টি মামলা রয়েছে। এই মামলাগুলি ডিক্রি বাস্ত্মবায়নের পর্যায়ে ঝুলে আছে।

[২১৪] ৩ জুন ২০১১, পারিবারিক আদালতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের (অনুরোধে নাম ও বিস্ত্মারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২১৫] ব্র্যাক হিউম্যান রাইটস এ- লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস -এর সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ঈশিতা ইসলামের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ই-মেইল যোগাযোগ; ৪, ৫ এবং ২৯ জুলাই ২০১২, ঢাকা। মামলাগুলি বিচার-পূর্ব অবস্থায় ঝুলে ছিল "ব্র্যাক-এইচআরএলএস -এর মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, প্রথমত সমন সংক্রান্ত্ম জটিলতার কারণে,"।

[২১৬] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর ধারা ১৬(ক) তে বলা হয়েছে যে যদি কোন আদালত উপলব্ধি করেন যে আদেশ জারির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাহলে উক্ত আদালত "মামলার কোন পক্ষকে মামলার উদ্দেশ্য ব্যাহত করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখার জন্য তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা হিসাবে যেভাবে প্রযোজ্য সেভাবে অন্ত্মর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে পারেন"। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ একটি মামলার ঘটনা শুনেছে যেখানে পারিবারিক আদালত এই অন্ত্মর্বর্তীকালীন ভরণপোষণের

ভরণপোষণ নির্ধারণের অস্পষ্ট মানদ-

এমনকি দীর্ঘ সময়ের আইনী লড়াই ও খুব ক্ষুদ্র পরিমাণ ভরণপোষনের রায় ছাড়া আর তেমন কিছুই দিতে পারে না। যদিও ভরণপোষনের পরিমাণ মামলা থেকে মামলায় ভিন্ন হয়, আইনজীবীরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলেছেন, তারা অনেক মামলা করেছেন যেখানে আদালত স্বামীর ক্ষমতা ও স্ত্রী চাহিদার উপর নির্ভর করে মাসিক ৮০০ টাকা থেকেও কম পরিমাণ ভরণপোষন নির্ধারণ করেছে। একজন বিচারক বলেছেন, "১৯৮০ দশকের এক মামলার রায়ে বিচারক অত্যন্ত সীমিত-মাসিক ২০০০ টাকা ভরণপোষনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, আপীলে সুপ্রীম কোর্ট সেটা কমিয়ে ৮০০ টাকা করেছে। তারপরেও জুন ২০১১ সাল পর্যন্ত সেই রায় বাস্তবায়ন হয়নি।"[২১৭] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ এবং ব্যক্তিগত আইন এই দুই জায়গাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে বিচারকগণ ভরণপোষনের রায় দিতে পারেন কিন্তু এর আওতা নির্ভর করে ধর্মীয় আইনের উপর। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মুসলিমদের জন্য ব্যক্তিগত আইন ভরণপোষন অনুমোদন করে বিবাহিত সময়কাল এবং তালাক পরবর্তী ৯০ দিন (অপেক্ষার সময়) বা গর্ভবর্তী হলে সন্তান জন্ম না হওয়া পর্যন্ত। হিন্দুদের জন্য বিবাহিত সময়কাল এবং পৃথক বসবাসকালীন (কোন তালাক নাই) অবস্থায় ভরণপোষনের অধিকারী, খ্রীস্টান নারীরা বিবাহ চলাকালীন বা বিচ্ছেদ অবস্থায় বা তালাকের পর এবং আদালতের কার্যক্রম চলাকালীন সময় পর্যন্ত ভরণপোষন দাবী করতে পারেন। যদিও আইনে এটা স্পষ্ট যে, বিচারকরা ভরণপোষনের রায় দিতে পারেন, তবে ভরণপোষনের পরিমাণ ও শর্তগুলি কী হবে সেটা নির্ধারণে অস্পষ্টতা রয়েছে। মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন লিখিত ক্ষেত্র নাই, শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে "পর্যাপ্ত" ভরণপোষন দিতে বাধ্য।[২১৮] হিন্দু ব্যক্তিগত আইনে বলা হয়েছে আদালতে নির্ধারিত ভরণপোষন "পক্ষসমূহের সামাজিক মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্বামীর ক্ষমতার মধ্যে থাকতে হবে"।[২১৯] খ্রীস্টান ও অন্যান্যরা যারা ধর্ম পালন করেন না এবং বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে বিয়ে করেছেন, তালাক আইনে বলা হয়েছে যে, বিচারক স্ত্রী ভরণপোষন নির্ধারনের সময় স্বামীর ক্ষমতা, পক্ষদ্বয়ের আচরণ এবং স্ত্রীর "ভবিষ্যত" বিবেচনা করতে পারেন।[২২০] সকল ধরনের নারীদের জন্যই ভরণপোষন নির্ধারনের ক্ষেত্রে আদালতের এই বিবেচনার ক্ষমতা ও সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা না থাকার বিষয়টি একটি বড় সমস্যা। কিন্তু মুসলিম নারীদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। কারণ তারা তালাক পরবর্তী ভরণপোষণের অধিকারী নয় এবং যদি তারা বৈবাহিক জীবনের বা বিচ্ছেদ পরবর্তী ভরণপোষণ দাবী করে তবে স্বামী তাদের একতরফা তালাক দিয়ে তাদের ভরণপোষনের দাবী বন্ধ করতে পারে।[২২১] অন্যান্য দেশের বিচারকদের ভরণপোষন নির্ধারনে সাহার্য্য করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা চালু করা হয়েছে যেটা আবেদনকারীদের এই বিষয়ে

আদেশ দিয়েছেন। পরবর্তীতে স্বামীর আপীলে ওই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ তুলে নেওয়া হয়। ২ জুন ২০১১ পারিবারিক আদালতের একজন বিচারকের (অনুরোধে নাম ও বিস্তারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের টেলিফোন সাক্ষাৎকার।

[২১৭] ৩ জুন ২০১১ ঢাকাতে পারিবারিক আদালতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের (অনুরোধে নাম ও বিস্তারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার। আদালত কর্তৃক স্বামীর ভরনপোষণ প্রদানের ক্ষমতার বিবেচনা ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণে অনেক তারতম্য ঘটিয়ে থাকে।

[২১৮] মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ বিবাহ চলাকালীন সময়ে ভরণপোষনের কথা বলে যে সালিশি পরিষদ ভরণপোষনের নির্দেশ দিতে পারে, কিন্তু ভরণপোষনের পরিমান নির্ধারণের জন্য কোন মানদ- নিদ্দিষ্ট করে দেয়না। যখন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীদের ভরণপোষনের বিষটি আলোচনা হয় তখন আইন 'পর্যাপ্ত' শব্দটি ব্যবহার করেছে। মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ৯(১)।

[২১৯] বিবাহিত হিন্দু নারীর পৃথক বাসগৃহ এবং ভরণপোষণ আইন ১৯৪৬, ধারা ৩।

[২২০] তালাক আইন ১৮৬৯, ধারা ৩৭।

[২২১] ২৬ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি পরিষদের পরিচালক(লিগাল এইড) রেহানা সুলতানা এর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

কিছুটা হলেও ধারণা দেয়।[২২২] যদিও আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তিগুলি ভরণপোষনের পরিমাণ নির্ধারনের বিষয়ে কথা বলেনা, তবে একটি আঞ্চলিক সংস্থা ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি মডেল আইন ভরণপোষণ ও ভরণপোষণের রায় বিষয়ক একটি উলেখযোগ্য আইন করেছে যা ভরণপোষনের ক্ষেত্র নির্ধারনে খুবই গুরন্নত্বপূর্ণ।[২২৩]ভরণপোষণের এইসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে; নির্ভরশীল পক্ষের অন্য পক্ষের পেশাগত উন্নয়নে অবদান, সম্পর্কের সময়কাল, নির্ভরশীল পক্ষের উপার্জন ক্ষমতার উপর সাংসারিক চাপের প্রভাব, নির্ভরশীল পক্ষের উপার্জন ক্ষমতা এবং পেশাগত উন্নয়নের ক্ষমতার উপর বাচ্চা দেখাশোর দায়িত্বের প্রভাব, নির্ভরশীল পক্ষ এবং অন্যপক্ষের বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত আয়, নির্ভরশীল পক্ষের নিজের দায়িত্ব নিজে নেওয়ার ক্ষমতা, স্বামী-স্ত্রীর মানষিক এবং শারিরিক স্বাস্থ্য ও বয়স, নির্ভরশীল পক্ষের চাহিদা ও জীবনযাত্রার মান; এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপায়।[২২৪]

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ৫ জন প্রাক্তন বিচারক, আইনজীবী, বিশেষজ্ঞ নারীদের সঙ্গে সাক্ষাতকারে দেখা গেছে ভরণপোষণ নির্ধারণে আইনগত ক্ষেত্রের অভাবে বিচারকদের মধ্যে অসঙ্গতিপূর্ণ রায়, অ-অনুমানযোগ্য ফলাফল এবং সংসারে নারীর ভূমিকা বিবেচনায় নেয়ার ব্যর্থতা নারীদের বিবাহিত ও বিবাহ পরবর্তী জীবনে অর্থনৈতিক অসমতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। প্রাক্তন বিচারকরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলেছেন- বাংলাদেশে পারিবারিক আদালত যখন ভরণপোষনের পরিমাণ নির্ধারন করেন তখন মূলত: বিবেচনা করেন স্বামীর ক্ষমতা এবং স্ত্রীর চাহিদা, কিন্তু কিভাবে তারা এগুলির মানদ- নির্ণয় করেন সে বিষয়ে খুবই কম স্পষ্টতা রয়েছে।[২২৫] প্রাক্তন বিচারকরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলেছেন, ভরণপোষন নির্ধারনের সময় আইন তাদেরকে বিয়ের কারনে স্ত্রীর শিক্ষা অর্জনে বা কর্মক্ষেত্রে যে বাঁধা, উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় যে ক্ষতি, বাচ্চা দেখাশুনা, সংসারের অন্যান্য কাজ স্বামীর ব্যবসা বা পেশাগত প্রশিক্ষণে অবদান রাখা এসব কোন কিছুই বিবেচনার সুযোগ দেয়না।[২২৬] একটি মামলার বিষয়ে আলোচনার সময় উঠে আসে যে, একজন স্ত্রী এবং তার পরিবার স্বামীর ডাক্তারী পড়ার জন্য তাদের

---

[২২২] ৫ জুন ২০১২ তারিখে সিঙ্গাপুরের আইনজীবি হালিজাহ্ মোহামেদ এর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার। নারী সনদ অনুযায়ী মুসলিম স্ত্রীরা বিবাহ বলবত অবস্থায় যেকোন সময় ভরণপোষনের দাবী করতে পারে। সিঙ্গাপুরের মুসলিম আইন প্রশাসন আইন অনুযায়ী তালাক পরবর্তীতে 'ক্ষতিপুরণ' বা মুতাহ্ এর অধিকারী। নারী সনদ অনুযায়ী অন্য নারীরা বিবাহ বলবত অবস্থায় বা বিবাহ পরবর্তী যেকোন সময়ে ভরণপোষন দাবী করতে পারে। সিঙ্গাপুর নারী সনদ ১৯৬১ এর ধারা ৬৯(৪) ও ১১৪; http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=CompId%3A61deee43-1e42-490f-a5ae-33054850e926;rec=0;whole=yes#P1VIII-. (সর্বশেষ দেখা ৪ এপ্রিল ২০১২)। ধারা ৬৯(৪) এ বলা হয়েছে যখন আদালত ভরণপোষনের আদেশ দিবেন তখন সু-নির্দ্দিষ্ট কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখবেন যার মধ্যে; স্ত্রীর আর্থিক চাহিদা, স্ত্রীর উপার্জনের ক্ষমতা(যদি থাকে), শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব, বিবাহের বয়স ও সময়কাল, সংসারের উন্নয়নে বিবাহের পক্ষসমূহের অবদান যার মধ্যে বাড়ী ও পরিবারের দেখাশোনা অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার তালাক আইন, ১৯৭৯ এর ধারা ৭(২) http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1979-070.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ৪ এপ্রিল ২০১২)।
অস্ট্রেলিয়ার পারিবারিক আইন ১৯৭৫ এর ধারা ৭৫ http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/fla1975114/ (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ৪ এপ্রিল ২০১২)।

[২২৩] কারিকম মডেল লেজিসলেশন অন মেইনটেন্যান্স এন্ড মেইনটেন্যান্স অর্ডারস, http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/model_legislation_maintenance.jsp (সর্বশেষ দেখা ১৫ নভেম্বর ২০১১)।

[২২৪] পূর্বোক্ত, ধারা ৮(৫)।

[২২৫] মে ও জুন ২০১১, পারিবারিক আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের (অনুরোধে নাম ও বিস্তারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।১৬ মে ২০১১ তারিখ আইন ও সালিস কেন্দ্রের আইনজীবি সালমা জেবীন; ২৬ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি পরিষদের পরিচালক(লিগাল এইড) রেহানা সুলতানা; এবং ১জুন ২০১১ তারিখ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিটিগেশন ইউনিটের প্রধান মাকসুদা আক্তারের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২২৬] পারিবারিক আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের (অনুরোধে নাম ও বিস্তারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যখন ভরণপোষনের পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন তখন এই বিষয়টি বিবেচনায় আনতে পারেননি। কারন আইন তাকে সেই ক্ষমতা দেননি। অন্যান্য প্রাক্তন বিচারকরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলেছেন, তারা ভরণপোষনের পরিমাণ নির্ধারনের সময় বিচ্ছেদ বা তালাক পরবর্তীতে স্ত্রীদের শ্রমবাজারে প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন না। কারণ কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা বা আইন নাই।[২২৭] অনেক নারীরাই বিয়ের পর চাকুরী বা লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। কারণ সামাজিকভাবে তাদের কাছে আশা করা হয় যে, তারা সংসারে কাজ করবে এবং পরিবারের যত্ন নিবে। এগুলিও পরবর্তীতে তাদেরকে শ্রমবাজারে প্রবেশে অসুবিধায় ফেলে। প্রতিবন্ধীত্ব থাকা বা একটি প্রতিবন্ধী বাচ্চা দেখাশুনাও বিচ্ছেদ বা তালাক পরবর্তীতে নারীদের উপার্জন ক্ষমতা হ্রাস করে। আবার এমন কোন নিশ্চয়তা নাই যে, আদালত ভরণপোষন নির্ধারনের সময় এটি বিবেচনা করবেন। তৃষ্ণা এইচআইভি পজেটিভ একজন নারী বলেছেন "তার স্বামী তাকে গর্ভবতী অবস্থায় পরিত্যাগ করে। সে বাচ্চার জন্মের পর থেকে যন্ত্রণাদায়ক মূত্রথলি সংক্রান্ত জটিলতায় ভুগছে। সে কাজ করতে পারেনা এবং তার বৃদ্ধ বিধবা মায়ের উপর নির্ভরশীল। সামান্য পরিমাণ ভরণপোষনের টাকাও তাদের সংসারে খুব উপকারে লাগবে। কিন্তু তৃষ্ণা অনানুষ্ঠানিক সালিশের মাধ্যমে এটি আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং তার আদালতে যাওয়ার ক্ষমতা নাই।[২২৮]

সামিরা পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্বামীকে তালাক দেয়। কিন্তু সে এখন কোন কাজ পাচ্ছে না যেটার পাশাপাশি সে তার প্রতিবন্ধী শিশুটিকে দেখাশুনা করতে পারবে। তার স্বামী সন্তানের কোন ভরণপোষন দেয় না, এমনকি তালাকের পরে ৯০ দিনের যে ভরণপোষন সেটাও দেয়নি।[২২৯] এটি অকল্পনীয় যে, আদালত ভরণপোষনের পরিমাণ নির্ধারনের সময় বৃদ্ধ বয়স, প্রতিবন্ধীত্ব বা অন্যান্য অসুস্থতার কথা বিবেচনা করবেন যদিওবা এগুলি তালাক বা বিচ্ছেদ পরবর্তীতে নারীদের উপার্জনের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। অথচ বৃদ্ধ নারীরা বছরের পর বছর সংসারের কাজ এবং পরিবারের দেখাশুনা করার জন্য তাদের জীবনটা ব্যয় করেছেন।

মেহ্বুবার গল্প

"আমি বৃদ্ধ, মনে হয় ৫০ বছরেরও বেশি, এখানে কেউই নাই যে আমাকে এক গস্নাস পানি দেবে। আমি একা থাকি।" মেহেবুবা, মুসলিম, ঢাকা, ২৪ মে ২০১১। মেহেবুবার ঘটনাটিতে দেখা যায় যে, তার ঘটনায় অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক বিষয় ছিল যেটা আদালত ভরণপোষন নির্ধারনের সময় বিবেচনা করতে পারতেন। কিন্তু মেহেবুবার কাছে কোন নিশ্চয়তা নাই যে, যখন আদালত ভরণপোষনের পরিমাণ চুড়ান্ত করবেন তখন এই বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন। মেহেবুবা, যে এখন পঞ্চাষোর্ধ যখন তার বাবা তাকে ও তার পরিবার ফেলে দ্বিতীয় বিয়ে করে তখন থেকেই সে তার কিশোরী জীবনের পুরোটাই গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ

[২২৭] পূর্বোক্ত।

[২২৮] ১৮ মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে মুসলিম নারী তৃষ্ণার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[২২৯] ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুরে মুসলিম নারী সামিরার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

করেছে। যখন সে সাবালিকা হয় তখন তার চাকুরীদাতা তার বিয়ের ঠিক করেন এমন এক লোকের সাথে যে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। মেহেবুবা জানত না তার স্বামীর ২০ বছর ধরে আরেকটি বউ রয়েছে। তার প্রথম স্ত্রীও এই বিয়ে সর্ম্পকে কিছুই জানত না এবং এর প্রতিশোধ নেয় সে মেহেবুবার উপর দিয়ে। "প্রথম স্ত্রী আমাকে ভাল করে খেতে দেয়নি। সে আমাকে মারতো, যদি আমি আমার স্বামীর কাছে নালিশ করতাম সেও আমাকে মারতো। একদিন সে আমাকে বিবস্ত্র অবস্থায় টানতে টানতে পুকুরে নিয়ে আসে এবং পানির মধ্যে চুবিয়ে দেয়। এরপরও আমি তাদের সাথে থাকি, আমার কোথাও যাবার জায়গা নাই। মানুষ আমাকে বললো যদি আমার বাচ্চা হয় তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। এখন আমার ৩ ছেলে। একদিন সে আমাকে এত বেশি মারল যে আমি আমার ছোট ছেলে যে তখন বুকের দুধ খায় তাকে নিয়ে পালিয়ে আসি এবং স্বামীকে তালাক দিই। মেহেবুবা ছেলেসহ ঢাকাতে চলে আসে, তার স্বামী তাকে মোহরানা, ৯০ দিনের খরপোষ বা সন্তানের ভরণপোষন কিছুই দেয়নি। সে বাড়ী বাড়ী কাজ করতো এবং পরবর্তীতে গামেন্টসে কাজ নেয়। সে এবং তার ছেলে ঢাকায় এক বস্তিতে থাকে। সে তার ছেলেকে মাদ্রাসায় পাঠিয়েছে কারণ সে স্কুলের খরচ যোগাতে পারে না। কয়েক বছর পর মেহেবুবা ঐ মাদ্রাসার এক মোলাকে বিয়ে করে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখে যে, তারও আরেক বউ এবং ৪ সন্তান রয়েছে যশোর জেলায়। যখন তারা ঢাকাতে একসাথে ছিল মেহেবুবা ঘর ভাড়া দিত। তার স্বামী তার কাছে টাকা চাইতো এবং যদি সে না দিত তাহলে তাকে মারধর করতো। সে তার সমস্ত সঞ্চয় ৬০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। যখন হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ মে ২০১১ তারিখে মেহেবুবার সাথে কথা বলেছিল তখন সে তার স্বামীর খবর জানে না ৪ বছর। ২০০৯ সালের এক দুর্ঘটনায় মেহেবুবার পায়ে সমস্যা হয় এবং শরীর ভেঙ্গে পড়ে। সে তখন গার্মেন্টসের কাজ ছাড়তে বাধ্য হয় এবং বাড়ীতে কাজ শুরন্ন করে যেখান থেকে মাসে ২২০০ টাকা পায়। সে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলে "আমি আমার বৃদ্ধ বয়সে চলার জন্য অনেক টাকা জমিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার কিছুই নাই। আমি তার কাছ থেকে কিছুই পায়নি এমনকি একটি লাল সূতাও না। তোমরা কি জানো এখন আমি দিনে কি খাই? আমি যে বাসায় কাজ করি সেই বাসা থেকে পানতা ভাত চেয়ে খায়।"[২৩০] ভবিষ্যতের চিন্তা করে মেহেবুবা ২০০৯ সালে মোহর ও ভরণপোষনের একটা মামলা করেছিল। তবে তার কোন ধারণা নাই যে, আদালত তার মামলার বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত নেবে। সে সরকারী সহায়তা কার্যক্রম সর্ম্পকেও কিছুই জানেনা যেটা তাকে সাহার্য্য করতে পারে। সে ভয় পাচ্ছে যে, আদালত তার পুরো বিষয়গুলিকে বিবেচনায় নাও আনতে পারে এবং সে হয়ত কোন কিছু না পেয়ে থেকে যাবে।

বাংলাদেশের ব্যক্তিগত আইনগুলির আরেকটি অস্পষ্ট বিষয় হলো নারীদের 'সতী' এবং 'বাধ্য' হতে হবে ভরণপোষনের অধিকার পেতে হলে। একমাত্র হিন্দু পারিবারিক আইনে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ভরণপোষন ও পৃথক বাসগৃহের অধিকারী হবে না যদি স্ত্রী 'অসতী' হয়।[২৩১] যদিও সংকলিত মুসলিম এবং খ্রীস্টান পারিবারিক আইন সতীত্ব বা বাধ্য ব্যবহার সর্ম্পকে কিছুই বলে না। কিন্তু পারিবারিক আদালতের আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলেছেন যে, অসংকলিত পারিবারিক আইনগুলি

[২৩০] ২৪মে ২০১১ তারিখ ঢাকাতে মুসলিম নারী মেহবুবার (ছদ্মনাম) সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাতকার।

[২৩১] বিবাহিত হিন্দু নারীর পৃথকবাসগৃহ এবং ভরণপোষণ আইন ১৯৪৬, ধারা ২। এই ধারাতে আরো বলা হয়েছে যদি স্ত্রী তার ধর্ম পরিবর্তন করে বা আদালতের দাম্পত্য সম্পর্ক পূনরম্নদ্ধারের আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় তবে সে ভরণপোষণের অধিকার হারাবে।

এখনও স্ত্রীর ভরণপোষনের ক্ষেত্রে সতীত্ব এবং দাম্পত্য দায়িত্ব পালনকে সত্য হিসেবে দেখে এবং আদালতের আলোচনার জন্য উন্মুক্ত রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একজন অধ্যাপক এরকম অনেক মামলার তথ্য সংরক্ষণ করেছেন যেখানে স্ত্রী 'দাম্পত্য দায়িত্ব' পালনে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে তার ভরণপোষনের দাবী প্রত্যাখান করা হয়েছে।[২৩২] অনেক আইনজীবীরাই বলেছেন, যে সকল পুরুষ ভরণপোষন দিতে অস্বীকার করে তারা অভিযোগ করেন যে, তাদের স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে এবং যার কারণে স্বামী সহবাসের জন্য কাছে পাচ্ছেন না। এসকল কাজের মাধ্যমে স্ত্রী তার দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।[২৩৩] তবে আইনজীবীরা আরও বলেছেন সাম্প্রতিকালের কিছু মামলায় যেখানে নারীরা তাদের সংসার থেকে যৌতুকের কারনে হয়রানী, পারিবারিক নির্যাতন, অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করা প্রভৃতি কারনে মা-বাবার বাড়ীতে গিয়ে বসবাস করছেন সেই ক্ষেত্রগুলিতে ভরণপোষনের আদেশ দেয়া হয়।[২৩৪]

অবাস্তব এবং বোঝাস্বরূপ আইনী প্রক্রিয়া

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এবং দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এই দুইটা আইনের অধীনে আদালত নারীদের ভরণপোষনের আবেদনগুলি পরিচালনা করেন। কিন্তু বাস্তবে আদালত কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং এমন কিছু বিধি রয়েছে যেগুলি অবাস্তব এবং বোঝাস্বরূপ। আর এই কারনে ন্যায্য ভরণপোষনের দাবীর মামলায় নারীদের পরাজয় হয়। সবচেয়ে বেশি সমস্যা রয়েছে সমন ও নোটিশ জারীর প্রক্রিয়ায়, সাক্ষ্য উপস্থাপন এবং ডিক্রী কার্যকরন পক্রিয়ায়।

সমন ও নোটিশ পদ্ধতি

পারিবারিক আদালতে একটি মামলা শুরন্ন করতে হলে সমন (বিবাদীকে আদালতে হাজির হবার নির্দেশ) এবং মামলার নোটিশ পাঠাতে হবে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ[২৩৫] এবং দেওয়ানী কার্যবিধি আইন[২৩৬] অনুযায়ী। দুঃখজনকভাবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যেসকল আইনজীবীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সমন পদ্ধতি নানা সমস্যা ও দীর্ঘসূত্রিতার বেড়াজালে আবদ্ধ, যার কারণে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে গেলে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর লেগে যায়। সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে সমন জারীর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিতে আদালতের ব্যর্থতা, সমনজারীকারী কর্মচারীদের ঘুষের চাহিদা এবং বিচারকদের তদারকির অভাব।[২৩৭]

---

[২৩২] ড. তাসলিমা মনসুর, জেন্ডার ইকুইটি এন্ড ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট: ফ্যামিলি ল এন্ড উইম্যান ইন বাংলাদেশ (ঢাকা, বৃটিশ কাউন্সিল,২০০৮) পৃ-৬৬।

[২৩৩] ১৬ মে ২০১১ তারিখ আইন ও সালিস কেন্দ্রের আইনজীবি সালমা জেবীন; ২৬ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী পরিষদের পরিচালক (লিগাল এইড) রেহানা সুলতানা র সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[২৩৪] মে, জুন ও সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ ঢাকাতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ লিগাল এইড ও সার্ভিসেস ট্রাস্ট ও আইন ও সালিস কেন্দ্রের আইনজীবিদের র সঙ্গে হিউম্যান রাইস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৩৫] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, ধারা ৭।

[২৩৬] দেওয়ানী কার্যবিধি আইন ১৯০৮, আদেশ ৫।

[২৩৭] বাংলাদেশে সমন পদ্ধতি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন-বাংলাদেশ আইন কমিশনের "রিপোর্ট অন রিকমেন্ডেশন ফর এক্সপেডাইটিং সিভিল প্রসিডিংস", ডিসেম্বর ২০১০, http://www.lawcommissionbangladesh.org/reports.htm (সর্বশেষ দেখা হয়েছে ৩ নভেম্বর ২০১১)।

পারিবারিক আদালতের অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, কারো বিরম্নদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য "সাধারণত অনধিক ৩০ দিনের" সময়সীমা বেঁধে দেবেন এবং কোড অব সিভিল প্রসিডিওর অনুযায়ী সমন জারী করবেন।[২৩৮] সমনজারীকারক কর্মচারীরা বাংলাদেশ দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি যদি যথাবিহিত ও যুক্তিসঙ্গত সকল চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিবাদীকে না পান বা বিবাদী সমন গ্রহণ না করেন, তবে যে গৃহে বিবাদী সাধারণত বসবাস করে বা ব্যবসা পরিচালনা করে সেই গৃহের কোন প্রকাশ্য কোন জায়গায় সমনের একটি কপি 'লটকাইয়া' দিবেন।[২৩৯] অথবা আদালত যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে বিশ্বাস করেন যে, বিবাদী সমন এড়াবার জন্য লুকিয়ে আছে বা অন্য কোন কারণে সাধারণ উপায়ে সমন জারী করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আদালত সমনের একটা নকল আদালতের কোন প্রকাশ্য স্থানে বা বিবাদী যে গৃহে সর্বশেষ বসবাস বা ব্যবসা পরিচালনা করেছিল সেই গৃহের কোন প্রকাশ্য জায়গায় সমনের একটি নকল 'লটকাইয়া জারী' করার আদেশ দিতে পারেন (এটাকে লটকাইয়া সমন জারী বলে)।[২৪০]

সমনের পাশাপাশি আদালত অভিযোগের একটা নকলসহ বিবাদীকে মামলার বিষয়ে নোটিশ পাঠাবেন। যখন আদালত বিবাদীর পক্ষ থেকে 'প্রাপ্তিস্বীকার' পাবেন তখন নোটিশ জারী হয়েছে বলে ধরে নিবেন। পারিবারিক আদালতের অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, যদি নোটিশ যথাযথ নিয়মে পাঠানো হয়ে থাকে তবে বিবাদী প্রাপ্তি স্বীকার করম্নক বা না করম্নক, ধরা হবে নোটিশ পাঠানোর ৩০ দিনের পরে সেটি কার্যকর হয়েছে।[২৪১]

যদি মামলার শুনানীর দিনে বিবাদী হাজির না হয় এবং বাদী প্রমাণ করতে পারে যে, নোটিশ বা সমন যথাযথভাবে জারী করা হয়েছে তবে আদালত একতরফা (একপক্ষের বক্তব্য শুনে) মামলা চালাতে পারেন অথবা নির্দেশ দিতে পারেন যে, একটি নতুন সমন ও নোটিশ জারী করা হোক। যদি সমন এবং নোটিশ অপর্যাপ্ত সময়ের মধ্যে জারী হয় যে কারনে বিবাদী জবাব তৈরী করতে পারেনি সেক্ষেত্রে শুনানি ২১ দিনের জন্য পেছানো যাবে।[২৪২]

সমন ও নোটিশ জারীর এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং বিবাদীর অনুপস্থিতিতে একতরফা কার্যক্রম এগুলির বাইরেও ভরণপোষন ও মোহরানার মামলার ক্ষেত্রে একতরফা মামলা শুরম্ন করার জন্য মাসাধিক বা বছরাধিক সময় অপেক্ষা করতে হয় যেটা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে আইনজীবী ও প্রাক্তন বিচারকরা বলেছেন।[২৪৩]

---

[২৩৮] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, ধারা ৭।

[২৩৯] বাংলাদেশ দেওয়ানী কার্যবিধি আইন ১৯০৮, আদেশ ৫ বিধি ১৭।

[২৪০] বাংলাদেশ দেওয়ানী কার্যবিধি আইন ১৯০৮, আদেশ ৫ বিধি ২০।

[২৪১] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, ধারা ৯।

[২৪২] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, ধারা ৭, ৮ ও ৯।

[২৪৩] পুর্বোক্ত, জুন ২০১১, পারিবারিক আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের (অনুরোধে নাম ও বিস্ত্মারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার । ১৬ মে ২০১১ তারিখ আইন ও সালিস কেন্দ্রের আইনজীবি সালমা জেবীন; ২৬ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি পরিষদের পরিচালক(লিগাল এইড) রেহানা সুলতানা; এবং ২১ মে ২০১১ আইনজীবি আ ন ম আব্দুল রহমানের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

একজন আইনজীবী বলেছেন, এক মক্কেলের সমন জারী করাতে আড়াই বছর সময় লেগেছে এবং ২০১১ সাল পর্যন্ত তারা বিবাদী স্বামীর পক্ষ থেকে জবাব দাখিলের অপেক্ষায় রয়েছেন। আদালতের ক্ষমতা রয়েছে আরও দ্রুত একতরফা পদ্ধতিতে মামলা চালানোর।[২৪৪]

আইনজীবী এবং বিচারকেরা আরও বলেছেন যে, সমন ও নোটিশ জারীকারক কর্মচারীদের ঘুষ নেবার প্রবণতা এই প্রক্রিয়াকে আরও বাধাগ্রস্ত করে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের একজন আইনজীবী বলেছেন যে, "একটা সমন জারী করাতে আমাদের ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা ঘুষ লাগে"।[২৪৫] অন্য একজন আইনজীবী বলেন, "স্বামীদের জন্য সমন গ্রহণ না করার খুবই সহজ। তার পরিবার জারীকারক কর্মচারীকে কিছু টাকা দিয়ে বলে যে, সে যেন বলে এই ঠিকানায় কেউ থাকে না।"[২৪৬]

একজন প্রাক্তন বিচারক যিনি পারিবারিক আদালতে নেজারত বিভাগের (যে বিভাগ সমন জারী করে) দায়িত্বে ছিলেন তিনি হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচের কাছে স্বীকার করেছেন এই বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট দুর্নীতি রয়েছে।[২৪৭] অন্য একজন বিচারক এর সাথে একমত হয়ে বলেছেন যে, এই বিভাগের কর্মচারী কম থাকা এবং জারীকারক কর্মচারীরা যাতায়ত বাবদ যে টাকা খরচ করেন সরকার থেকে তা যথাসময়ে পরিশোধ না করার কারনে দুর্নীতি আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২৪৮]

সমন এবং নোটিশ জারী প্রক্রিয়ায় বিচারকদের স্বল্প তদারকিও মোহর ও ভরণপোষনের মামলাগুলি দীর্ঘায়িত করার আরেকটা কারণ। তাছাড়া বিচারকদের উপর মামলা দেখার ব্যাপক দায়িত্বের পাশাপাশি এই বিভাগের তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়। একজন প্রাক্তন বিচারক বলেছেন,"একজন কার্যরত বিচারককে নেজারত দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়। তথ্য ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, সমনের ক্ষেত্রে জট আছে কিনা তা দেখা এবং এগুলি করা না হলে কর্মচারীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মত সময় তাদের হাতে নাই।"[২৪৯] অনেক প্রাক্তন বিচারক হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলেছেন যে,"বিচারকদের সবসময় সমন ও নোটিশ প্রক্রিয়ার বিষয়ে দক্ষতা থাকে না এবং এর জন্য তিনি অনভিজ্ঞতা ও অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, পারিবারিক আদালত হলো নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের প্রথম কর্মক্ষেত্র, তারা সাধারণত এক সপ্তাহ প্রশিক্ষণ এই পদে যোগদানের আগে। একজন বলেন, যখন আপনি মাত্র এক সপ্তাহের

---

[২৪৪] ১৬ মে ২০১১ তারিখ আইন ও সালিস কেন্দ্রের আইনজীবি সালমা জেবীনের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৪৫] ৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি লিটিগেশন ইউনিটের প্রধান মাকসুদা আক্তারের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[২৪৬] ২৬ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি আইনজীবি দেবাশিষ দত্তের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৪৭] ২ জুন ২০১১, পারিবারিক আদালতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের (অনুরোধে নাম ও বিস্তারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার ।

[২৪৮] ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১, ঢাকাতে জেলা আদালতের বিচারক ও জাতীয় আইন সহায়তা সংস্থার পরিচালক সৈয়দ আমিনুল ইসলামের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৪৯] ২ জুন ২০১১, পারিবারিক আদালতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের (অনুরোধে নাম ও বিস্তারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তখন আপনি নিজেই প্রক্রিয়া বিষয়ে নিশ্চিত নন-সুতরাং আপনি সমনের জন্য বেশি সময় দিবেন এবং একতরফা কার্যক্রম শুরম্ন করতেও বেশি সময় দিবেন।"[২৫০]

দেওয়ানী বিচারব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ আইন কমিশনের ২০১০ সালের সুপারিশে সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে যে সমন এবং নোটিশ পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। তারা সুপারিশ করেছেন যে, সমন জারীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কুরিয়ার (সরকারী ডাক বিভাগের পরিবর্তে), ফ্যাক্স ও ই-মেইল ব্যবহার করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া দ্রম্নত করার অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন।[২৫১] দেওয়ানী বিচারব্যবস্থা পর্যালোচনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারও সমন ও নোটিশ পদ্ধতির সংস্কারের বিষয়টি বিবেচনা করছেন।

সাক্ষ্য প্রমাণের সমস্যা

নারীদের তাদের মোহর বা ভরণপোষনের আবেদন সফলভাবে দাখিল করার জন্য অবশ্যই বিয়ের প্রমাণ দিতে হবে।[২৫২] একজন নারী যদি এই বিশ্বাসে কারোর সাথে বসবাস করেন যে, তারা বিবাহিত কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সেটা বিবাহ নয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন ঐ ভরণপোষনের অধিকারের স্বীকৃতি দেয় না।[২৫৩] যেখানে সম্ভব নারী তার বিয়ের দালিলিক প্রমাণ যেমন কাবিননামার নকল সরবরাহ করবেন।[২৫৪] যেখানে কোন দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে আদালত মৌখিক সাক্ষ্য বা এফিডেফিট ইত্যাদি হাজিরের অনুমতি দেয়। তবে সবসময় এটা দেয়া হয় না।[২৫৫]

অন্যদিকে স্ত্রীদের জন্য বিয়ের দালিলিক প্রমাণ যোগাড় করা কঠিন। হিন্দু বিয়ের আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন হয় না। তাই তাদের কোন বিয়ের দলিল থাকে না। তাদেরকে অবশ্যই অন্যান্য সাক্ষ্য যেমন, সাক্ষীদের বক্তব্য যে তারা হিন্দু ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিয়ে করেছিল, মুসলিম এবং খ্রীস্টানদের বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুসলিম দম্পতিরাও বিবাহ নিবন্ধন করেন না।[২৫৬]

---

[২৫০] ৩ জুন ২০১১, পারিবারিক আদালতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের (অনুরোধে নাম ও বিস্ত্মারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৫১] বাংলাদেশ আইন কমিশনের " রিপোর্ট অন রিকমেন্ডেশন ফর এক্সপিডেটিং সিভিল প্রসেডিংস", ডিসেম্বর ২০১০, পৃ২-৩, http://www.lawcommissionbangladesh.org/reports.htm (সর্বশেষ দেখা ৩ নভেম্বর ২০১১)।

[২৫২] ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ধারা ১০১: "যিনি কোন বিষয়ের অস্ত্মিত্ব দাবী ওে তার উপর নির্ভরশীল কোন আইনী অধিকার বা দায় সম্পর্কে আদালতের রায় কামনা করেন, তিনি সেই বিষয়ের অস্ত্মিত্ব অবশই প্রমান করবেন। কোন ব্যক্তি যখন কোন বিষযের অস্ত্মিত প্রমান করতে বধ্য থাকেন, তখন বলা হয় যে, সেই বিষটি প্রমান করার দায়িত্ব সেই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত্ম।"

[২৫৩] অতিরিক্ত তথ্যের জন্য উপরোক্ত বিবাহ অধ্যায়ের " বিবাহ, তালাক ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত্ম আইন" অধ্যায়টি দেখুন।

[২৫৪] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর ধারা ২০, ১০,১১ ও ১২। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর ধারা ২০ এ বলা হয়েছে-১০ ও ১১ ধারা সংশিস্নষ্ট বিষয়ে যেটা প্রি-ট্রায়াল এবং ক্যামেরা ট্রায়াল পদ্ধতি সংক্রান্ত্ম, সেই ড্রোত্রে ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন প্রজোয্য হবে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর ১২ ধারায় সাড়্গীদের কিভাবে জেরা করা হবে, বিশেষ করে বলা হয়েছে যে সাড়্গীরা আদালতে তাদের নিজেদের ভাষ্য বা এফিডেভিট এর মাধ্যমে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন এর ধারা ৬১, ৬২ ও ৬৪। ধারা ৬১ তে বলা হয়েছে যে কোন দলিলের বিষয়বস্তু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক সাড়্গ্যেও দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। ৬২ ধারায় প্রাথমিক সাড়্গ্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে য়্গে সংশিস্নষ্ট দলিলটিই আদালতে পরিদর্শনের জন্য দাখিল করা। ধারা ৬৪ তে বলা হয়েছে শুধুমাত্র ৬৫ ধারায় বর্ণিত ড্রোত্রসমূহ ব্যাতীত সকলড্রোত্রে দলিল অবশ্যই প্রাথমিক সাড়্গ্য দ্বার প্রমাণ করতে হবে।

[২৫৫] পূর্বোক্ত, ধারা ৬৩ ও ৬৫। ধারা ৬৩ তে মাধ্যমিক সাড়্গ্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে যে ব্যক্তি কোন দলিল দেকে থাকলে, তার দেওয়া ওই দলিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মৌখিক বিবরণ ও অন্তর্ভুক্ত। সাক্ষ্য আইন এর ধারা ৬৫ তে বলা হয়েছে যে কোন কোন ড্রোত্রে কোন দলিলের অস্ত্মিত্ব, অবস্থা বা বিষয়বস্তু প্রমানের জন্য মাধ্যমিক সাড়্গ্য দেওয়া যেতে পারে।

[২৫৬] অতিরিক্ত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ২য় অধ্যায়ে মুসলিম "বিবাহের চুক্তি ও নিবন্ধীকরণ" অধ্যায়টি দেখুন।

এমনকি যেখানে বিয়ের নিবন্ধন হয়েছে সেখানেও বিশেষত মুসলিম নারীদের জন্য নিবন্ধনের দলিল যোগাড় করা কঠিন। হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ একজন মুসলিম নারীর সাক্ষাতকার নিয়েছেন যিনি বলেছেন যে, যখন তার বিয়ে হয় কাজী তাকে বিয়ের কোন কাগজ দেননি। পরবর্তীতে মোহর বা ভরণপোষনের জন্য এই দলিল বের করা কঠিন। এদেশে কম্পিউটারে বিয়ের নিবন্ধনের তথ্য সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নাই, এটি নারীদের আরো ঝামেলায় ফেলে দেয় বিশেষত; যারা বিয়ের পর অন্য জেলায় চলে যান। আরেকটি বিষয় হল খরচ। শুধুমাত্র নকল তোলার খরচ নয়, কিছু কিছু কাজী অনেক বেশি টাকা দাবী করেন কাগজ তোলার জন্য।[২৫৭]

ফজলুল হক যিনি বাংলাদেশে লিগ্যাল এইডের প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এ্যাসোসিয়েশন এর প্রধান যেখানে অসংখ্য পারিবারিক মামলা দেখাশুনা করা হয়, বলেন যে-কিছু কাজী বিবাহ রেজিস্ট্রার জালিয়াতি করেন যদি স্বামী মোহর ও ভরণপোষন না দেবার জন্য কাজীকে ঘুষ দেন। "কাজীদের কেনা যায়, আমি নিজে দেখেছি ম্যারেজ রেজিস্ট্রি বইয়ের অনেক পাতা ছেঁড়া।"[২৫৮]

একজন কাজী হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ এর কাছে এই দূর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন। নাম না প্রকাশ করার শর্তে তিনি বলেন,"আমরা সরকার থেকে কোন ভাতা পাই না। আমরা বিবাহ নিবন্ধনের ফি থেকে একটা অংশ পাই এবং বাকীটা চলে যায় সরকারের কাছে। তদারকি প্রক্রিয়াও দূর্নীতিগ্রস্ত্ম, তারা আমাদের কাছ থেকে টাকা চায়। তাই যেভাবে হোক আমাদেরকে বেশি টাকা রোজগার করতে হয়। সেজন্যই ঘুষ নেয়া হয়।"[২৫৯]

যদিও আদালতের উচিত বিবাহের প্রমাণ হিসেবে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা কিন্তু তারা সবসময় এটা করেন না।[২৬০] বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট্রের একজন আইনজীবী জানান, যেক্ষেত্রে সন্ত্মান থাকে সেক্ষেত্রে আদালত মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণে ইতিবাচক থাকেন।[২৬১] যদিওবা আদালত বিয়ের প্রমাণ হিসেবে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণের অনুমতি দেন তবুও সাক্ষীদের ডাকা এবং তাদের যাতায়ত ও থাকা-খাওয়া অনেক ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। আদালত বা লিগ্যাল এইড ফান্ড এই খরচ বহন করে না। অনেক দরিদ্র নারীই সাক্ষীদেরকে আদালতে নিয়ে আসার খরচ বহন করতে পারেন না।[২৬২]

---

[২৫৭] ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুর জেলার মাদরীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন এর সেক্রেটারী ফজলুল হকের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার: ৪ জুন ২০১১ তারিখ গাজীপুরে মুসলিম নারী নিম্মির সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৫৮] ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুর জেলার মাদরীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন এর সেক্রেটারী ফজলুল হকের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৫৯] মে ২০১১ তারিখ এ ১০ বছরের বেশী সময় সনদ রয়েছে এমন কজন কাজীর (অনুরোধে নাম ও বিস্ত্মারিত অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৬০] ২৯ মে ২০১১ তারিখ মাদারীপুর জেলার সরকারী আইনজীবি শাহানা শৈলির সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৬১] ২৫ মে ২০১১ তারিখ বস্নাস্টের ফরিদা ইয়াসমিনের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৬২] ২৫ মে ২০১১ তারিখ রেহানা সুলতানার সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

আদালতের ডিক্রি বাস্তবায়ন

যদিও বা আদালত মোহর বা ভরণপোষনের ডিক্রী দেন, নারীদেরকে সেই ডিক্রী বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় আবেদন করতে হয়।[২৬৩] যদি স্বামী টাকা দিতে ব্যর্থ হয় তবে আদালত তাকে জরিমানা বা তিনমাস পর্যন্ত কারাদ- দিতে পারেন।[২৬৪] এই শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও ডিক্রী বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় লাগে। একজন আইনজীবী হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলেছেন, তার একজন মক্কেল ২০০৮ সালে পাওয়া ডিক্রী বাস্তবায়নের জন্য এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছেন যে, তিনি প্রশ্ন করেন "আমি কি আমার মৃত্যুর আগে পাওনাটা পাবো?"[২৬৫]

যদিও পারিবারিক আদালতের অধ্যাদেশে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, বাস্তবে যখন কোন নারী ডিক্রী বাস্তবায়নের জন্য আবেদন করেন তখন প্রায়ই আদালত তাদের কাছে তাদের স্বামীর সম্পত্তি বা বেতন বা ব্যাংক একাউন্টের প্রমাণ চান। এটা বলা অনেক নারীর জন্য কষ্টকর।[২৬৬] বেশিরভাগ নারীরই এসব তথ্যের বিষয়ে কোন ধারণা নাই বিশেষ করে যখন বিয়ে ভেঙে গেছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্পত্তির উপরে নিয়ন্ত্রণ স্বামীর কিন্তু তাদের নামে মালিকানা নাই। কেউ কেউ আবার শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য জমি ও বাড়ী কিনে তাদের বাবা-মা'র নামে রাখে (কিছুক্ষেত্রে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য)।[২৬৭]

যৌথ পরিবারের ঝুঁকি আরও বেশি। অনেক আইনজীবী বলেছেন তারা অনেক মামলা করছেন যেখানে বিবাহিত নারীরা শুধু স্বামীর পরিবারে নয়, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর যৌথ পরিবারে অনেক ভূমিকা রেখেছেন।[২৬৮] অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বৈবাহিক বাড়িটা হয়ত শ্বশুরের নামে।

দারিদ্র্যও একটা বিশাল প্রতিবন্ধকতা হিসেবে হাজির হয়। অনেক আইনজীবী বলেছেন অনেক সময় তারা খুব হতাশ বোধ করেন যখন দেখেন একটি অসহায় দরিদ্র নারীর মোহর ও ভরণপোষণের ডিক্রী বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না কারণ স্বামীও অনেক দরিদ্র।[২৬৯]

তারা একমত হয়েছেন যে যেখানে স্বামীরা ভরণপোষণ প্রদানে অসমর্থ সেখানে পারিবারিক আদালত ব্যবস্থার সাথে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচীর একটা যোগসূত্র স্থাপন করা দরকার। মোহর ও ভরণপোষনের ডিক্রী বাস্তবায়নের আবেদন একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এরমধ্যে অনেক নারীরাই

---

[২৬৩] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, ধারা ১৬ (৩)।

[২৬৪] পুর্বোক্ত, ধারা ১৬।

[২৬৫] ১ জুন ২০১১ তারিখ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিটিগেশন ইউনিটের প্রধান মাকসুদা আক্তারের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৬৬] ২১ মে ২০১১ আইনজীবি আ ন ম আব্দুল রহমান এবং ১৬ মে ২০১১ তারিখ আইন ও সালিস কেন্দ্রের আইনজীবি সালমা জেবীনের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৬৭] ১৯ মে ২০১১ তারিখ আইনজীবি ফৌজিয়া করিম;, ২৫ মে ২০১১ সালে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সিনিয়র উপ-পরিচালক, মেডিয়েশন ও র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট, নীনা গোস্বামী; ১৬ মে ২০১১ তারিখ আইন ও সালিস কেন্দ্রের আইনজীবি সালমা জেবীনের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৬৮] ২৪ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি পরিষদের পরিচালক(লিগাল এইড) রেহানা সুলতানা; ২৫ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ লিগাল এইড ও সার্ভিসেস ট্রাস্টের ফরিদা ইয়াসমিন, উপ-পরিচালক (আইন); ১ জুন ২০১১ তারিখ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিটিগেশন ইউনিটের প্রধান মাকসুদা আক্তার ; এবং ১৬ মে ২০১১ তারিখ আইন ও সালিস কেন্দ্রের আইনজীবি সালমা জেবীনের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৬৯] পূর্বোক্ত, ১৬ মে ২০১১ তারিখে নিজেরা করির সমন্বয়কারী খুশী কবিরের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

চরম আর্থিক অনটনের মুখে পড়েন। পারিবারিক আদালত অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক প্রতিকারের আদেশ[২৭০] দিতে পারেন কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেছেন এটা খুবই বিরল। আইনজীবী ও প্রাক্তন বিচারকরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন, ডিক্রী বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা এত বেশি যে কাযকরণ পদ্ধতি সংস্কার বা কার্যকরী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চালু করা অতীব জরুরি। বাংলাদেশ আইন কমিশন ২০১০ সালের দেওয়ানী বিচারব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার সুপারিশে বলেছেন "ডিক্রী বাস্তবায়নের আবেদনের নিয়ম মূল মামলার সাথে সাথে করা প্রয়েজন।"[২৭১]

"আইনগত" হয়রানি

যে সকল স্বামীরা মোহর ও ভরণপোষনের মামলার বিবাদী তারা প্রায়ই স্ত্রীদের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা বা ফৌজদারী অভিযোগ দায়ের করে থাকেন তাদেরকে হয়রানী করার জন্য; এরমধ্যে দাম্পত্য পুনরুদ্ধারের মামলা এবং চুরির অভিযোগ অন্তর্ভূক্ত।

দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার

বাংলাদেশে ব্যক্তিগত আইন দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মামলার অনুমোদন দেয়। এই আইনী দাবিটা সকল ধরনের জনগোষ্ঠীর জন্য পারিবারিক আদালতে স্বীকৃত। খ্রীস্টানদের ডির্ভোস আইনে বলা হয়েছে যে, যখন একপক্ষ কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই অন্যপক্ষের সমাজ থেকে বেরিয়ে আসে তখন অন্যপক্ষ দাম্পত্য সর্ম্পক পুনরুদ্ধারের মামলা করতে পারে।[২৭২] বিবাহিত হিন্দু নারীর পৃথক বাসগৃহ এবং ভরণপোষনের আইনে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীরা ভরণপোষন বা পৃথক বাসগৃহের অধিকারী হবেন না যদি তারা আদালতের দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধারের রায় না মানেন।[২৭৩] মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধি স্বামীকে পুনঃবিবাহের অনুমতি দেয় যদি প্রথম স্ত্রী আদালতের দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধারের ডিক্রী না মানেন। পারিবারিক আদালতের দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধারের মামলা পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে।[২৭৪] বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাটকোর্ট বিভাগের এবিষয়ে একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। কমপক্ষে তিনটি মামলায় বলা হয়েছে যে, কোন আদালতই একজন স্বামী বা স্ত্রীকে একসাথে বসবাসের নির্দেশ দিতে পারেন না। কারণ এটি তাদের সাংবিধানিক অধিকার অর্থাৎ আইনের দৃষ্টিতে সমতা, রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সর্বত্র নারীর সমান অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ন করে।[২৭৫]

---

[২৭০] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, ধারা ১৬ ক।

[২৭১] বাংলাদেশ আইন কমিশনের " রিপোর্ট অন রিকমেন্ডেশন ফর এক্সপেডাইটিং সিভিল প্রসিডিংস", পৃ-৬-৭।

[২৭২] তালাক আইন ১৮৬৯, ধারা ৩২।

[২৭৩] বিবাহিত হিন্দু নারীর পৃথকবাসগৃহ এবং ভরণপোষণ আইন ১৯৪৬, ধারা ২।

[২৭৪] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, ধারা ৫ খ।

[২৭৫] শারমিন হোসেন ওরফে রূপা বনাম মিজানুর রহমান, ২ BLC ৫০৯; নেলী জামান বনাম গিয়াসউদ্দিন ৩৪ DLR ২২১; শিরিন আখতার ও অন্যান্যরা বনাম মো: ইসমাইল ৫১ DLR ৫১২ ।

পারিবারিক আদালতের আইনজীবী ও প্রাক্তন আইনজীবীরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলেছেন সাধারণত স্ত্রীরা মোহর ও ভরণপোষনের মামলা দায়ের করলে স্বামীরা তাদের হয়রানী করার জন্য দাম্পত্য জীবন পুনরম্নদ্ধারের মামলা করে থাকেন।[২৭৬]

বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির একজন আইনজীবী ব্যাখ্যা করেছেন-
"শুধুমাত্র মোহর ও ভরণপোষন না দেবার জন্যই অনেক মামলাতে স্বামীরা দাম্পত্য জীবন পুনরম্নদ্ধারের মামলা করে থাকেন। বেশিরভাগ মামলাই ডিক্রী হওয়া অবধি পৌঁছায় না। সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুনানি পূর্ব অবস্থাতে স্বামীরা মামলা না চালানোর বিষয়ে একমত হন। এটা মূলতঃ নারীদের উপর একধরনের মানসিক নির্যাতন করা। বলতে পারেন এক ধরনের হয়রানিমূলক চিন্ত্মা।"[২৭৭]

দাম্পত্য জীবন পুনরম্নদ্ধারের মামলার ডিক্রী সকল ধর্মের নারীদেরই অধিকার ভঙ্গ করে কিন্তু হিন্দু নারীদের জন্য এটি অত্যন্ত্ম সমস্যাজনক, যেহেতু হিন্দু নারীদের তালাক অসম্ভব। একটি হিন্দু বিবাহ যত কষ্টকর বা র্নিযাতনের হোক না কেন, কোনভাবেই এটা থেকে বিচ্ছেদ সম্ভব নয়।[২৭৮]

চুরির অভিযোগ

মানবাধিকারকর্মী এবং আইনজীবীরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচকে বলেছেন অনেক মামলাতেই স্ত্রীরা স্বামীর বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে মোহর বা ভরণপোষনের মামলা করেন। অন্যদিকে স্বামী স্ত্রীর বিরম্নদ্ধে চুরি করার ফৌজদারীর অভিযোগ আনেন এই বলে যে, স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তার ব্যক্তিগত সামগ্রী নিয়ে গেছেন। তখন নারীদের ফৌজদারী আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সময়, শক্তি ও টাকা খরচ করতে হয়। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্টের একজন আইনজীবী যিনি বহুবছর ধরে নারীদেরকে ভরণপোষনের মামলায় সহায়তা দিয়েছেন, বলেন অনেক স্ত্রীরাই তাদের স্বামীদের বাড়ী থেকে পালিয়ে আসার পর স্বর্ণালংকার, কাপড়চোপড় এবং টাকা চুরির মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়েন। আমরা প্রতি বছর এরকম ৩০-৫০টি মামলা পেয়ে থাকি।[২৭৯]

বস্নাস্টের আরেকজন সালিশ বিশেষজ্ঞ অন্য একটি ঘটনার কথা বলেন যেখানে স্ত্রী স্বামীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে মার খেয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং তারপর মোহর ও ভরনপোষনের জন্য সালিশের আবেদন করেন। কিন্তু সেটা শেষ হওয়ার আগেই স্বামী ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন এই অভিযোগে যে সে একলক্ষ ষাট

---

[২৭৬] ১৬ মে ২০১১ তারিখ আইন ও সালিস কেন্দ্রের লিটিগেশন ইউনিটের আইনজীবী ফারহানা আফরোজের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার; মে ২০১১, পারিবারিক আদালতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের (অনুরোধে নাম ও বিস্ত্মারিত তথ্য অপ্রকাশিত) সঙ্গে হিউম্যান রাইস ওয়াচের সাক্ষাৎকার। আরো দেখুন- আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিনের, জুডিশিয়াল এক্টিভিজম এন্ড ফ্যামিলি ল ইন বাংলাদেশ ২০০৯, প্রফেসর মাহফুজা খানম এন্ড ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ট্রাস্ট ফান্ড লেকচার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,
http://www.asiaticsociety.org.bd/journals/June_2010/contents/03_Alamgir%20Muhammad%20Serajuddin.htm#_ftn1 (accessed January 15, 2011). আইনজীবিরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন খুব কম ক্ষেত্রেই যখন স্বামীরা ভরনপোষণ ও মোহরের দাবীতে সাড়া দেয়না তখন নারীরা দাম্পত্য জীবন পুনরম্নদ্ধারের প্রতিকার নিতে বাধ্য হয়।

[২৭৭] ২৪ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি পরিষদের পরিচালক(লিগাল এইড) রেহানা সুলতানার সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৭৮] বিবাহিত হিন্দু নারীর পৃথকবাসগৃহ এবং ভরণপোষণ আইন ১৯৪৬, ধারা ২।

[২৭৯] ২৫ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ লিগাল এইড ও সার্ভিসেস ট্রাস্টের ফরিদা ইয়াসমিনের, উপ-পরিচালক (আইন) সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

হাজার নগদ টাকা, চার লক্ষ টাকার স্বর্ণ, জমির দলিল এবং চলিশ হাজার টাকার কাপড়-চোপড় চুরি করে নিয়ে চলে এসেছেন।[২৮০] আইনজীবী যারা স্ত্রী এবং তাদের পরিবারকে এধরনের মামলায় আইনী সহায়তা দেন তারা বলেছেন যে, বেশিরভাগ মামলায় স্বামী বেশিদূর পরিচালনা করেন না। আদালতের বাইরে তারা সমাধান করেন এবং পরবর্তীতে আদালত মামলা খারিজ করে দেন।[২৮১] কিছু কিছু মামলায় নারীদের আটক করা হয় যেখানে তারা জামিনে বের হয়ে আসেন বা পরবর্তীতে অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়।

---

[২৮০] ২৫ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ লিগাল এইড ও সার্ভিসেস ট্রাস্টের সহকারী সমন্বয়কারী (সালিশ) তাপসী রাবেয়ার সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাক্ষাৎকার।

[২৮১] ২৫ মে ২০১১ সালে বাংলাদেশ লিগাল এইড ও সার্ভিসেস ট্রাস্টের ফরিদা ইয়াসমিন, উপ-পরিচালক(আইন), এম ডি বরকত আলী, সহকারী-পরিচালক (আইন) এবং তাপসী রাবেয়া, সহকারী সমন্বকারী (সালিশ) এর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দলীয় সাক্ষাতকার; ২এপ্রিল ২০১১ বস্নাস্টের ২০ জন প্যানেল আইনজীবীর সাথে দলীয় আলোচনা।

৫. তালাকপ্রাপ্ত, পৃথক বসবাসকারী এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা

বিবাহিত নারীদের ভরণপোষণ, *দেনমোহর*, কিংবা বৈবাহিক সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তিতে সহায়তা দানের লক্ষ্যে পারিবারিক আইন এবং আদালতের কার্যপ্রণালী যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে সেটি তাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াগুলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যেসব পরিবারে খুব অল্প পরিমাণ সম্পত্তি আছে কিংবা যাদের স্বামীর আয়-উপার্জন অত্যন্ত কম বা একেবারে নেই, সেসব পরিবারের বিবাহ বিচ্ছিন্ন, পৃথক বসবাসরত বা স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের রাষ্ট্রীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি থেকে সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। অনেকে হয়তো চাকরি খুঁজবেন এবং তাদের পরিবারের দেখভালও করতে পারবেন। কিন্তু বিবাহ সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী সংকটময় সময়টাতে তাদের অত্যন্ত দ্রুত সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি থেকে সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন।

এই অধ্যায়ে তালাক এবং বিবাহ বিচ্ছেদের বিরূপ অর্থনৈতিক অভিঘাত প্রশমনে রাষ্ট্রের যে ভূমিকা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে আছে নারীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নারী প্রধান পরিবারগুলোর জন্য সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি চালু করা এবং কিছু ভূমি বন্টন কর্মসূচির দ্বারা যাতে নারীরা উপকৃত হয় তা নিশ্চিত করা প্রভৃতি। তবে একই সাথে যে বাস্তবতা বিরাজ করছে সেটি হলো, এসব কর্মসূচি যেসব নারীদের প্রয়োজন তাদের অনেকের কাছে সেগুলো পৌঁছাচ্ছে না। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট আইন ও কর্মসূচিগুলো (বিশেষ করে ভবঘুরেদের জন্য প্রণীত আইন যেখানে গৃহহীনতাকে অপরাধের ধারণার সাথে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং ভূমি বন্টন কর্মসূচি যার একটির শর্ত হলো, ভূমি পেতে হলে আবেদনকারী নারীর একজন "শারীরিকভাবে সমর্থ" পুরুষ থাকতে হবে) এসব ইতিবাচক পদক্ষেপের গুরুত্বকে কমিয়ে দিচ্ছে।

নারীদের জন্য সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

যে সব নারী পারিবারিক সহিংসতা থেকে বের হয়ে আসতে চান[২৮২], কিংবা তালাক, বিবাহ বিচ্ছিন্ন বা পরিত্যক্ত হবার পরে যেসব নারীকে তাদের বৈবাহিক বাড়ী (গধৎরঃধষ ঐড়সবং) থেকে বের করে দেওয়া হয়, তাদের জন্য অস্থায়ী সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহারের সুযোগ পাওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশ সরকার নারীদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে সংশ্লিষ্ট এডভোকেট ও কর্মকর্তারা মনে করেন, প্রয়োজনের তুলনায় এসব আশ্রয় কেন্দ্র যথেষ্ট নয়। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন

---

[২৮২] আরও দেখুন পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০, ধারা ১৫। এই আইনটি পারিবারিক সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র নিশ্চিত করতে আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই আইনবলে আদালত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে "অংশীদারী বাসগৃহ" একচেটিয়া বা আংশিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে অপরাধ সংঘটনকারীর প্রতি আদেশ জারী করতে পারেন। আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, "অংশীদারী বাসগৃহ" ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য নিরাপদ নয়, তাহলে তার জন্য বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা কিংবা অনুরূপ বাসস্থানের ভাড়া প্রদানের জন্যও আদালত অপরাধ সংঘটনকারীকে নির্দেশ প্রদান করতে পারেন। আইনটি এ ধরনের আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে সরকারের জন্যও বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে, যেখানে পারিবারিক সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদেরকে অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

কর্মকর্তা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্‌কে বলেছেন, মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুদের জন্য প্রত্যেক বিভাগে একটি করে মোট সাতটি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করছে। প্রত্যেক আশ্রয় কেন্দ্র ছয় মাস সময় পর্যন্ত ৫০ জন নারী ও ১০০ শিশুর জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। এটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও জেলা পর্যায়ে আরও অধিক আশ্রয় কেন্দ্র প্রয়োজন বলে ঐ কর্মকর্তা মনে করেন:

> প্রত্যেক বিভাগে একটি আশ্রয় কেন্দ্র থাকলে কি হবে? আশ্রয় কেন্দ্র খুঁজলেও এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নারীরা তো আর বিভাগীয় সদরে যাবেন না.....। বিপদগ্রস্ত নারীদের সহযোগিতার জন্য আমাদের প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে একটি করে আশ্রয় কেন্দ্র প্রয়োজন। আর এসব আশ্রয় কেন্দ্রে নারীদের জন্য আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া উচিত।[২৮৩]

ভবঘুরেদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র

সমগ্র বাংলাদেশে সরকার ছয়টি "ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্র" পরিচালনা করছে। এই আশ্রয় কেন্দ্রগুলো বেঙ্গল ভেগরেন্সি এ্যাক্ট, ১৯৩১ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে উক্ত আইনটির স্থলে বর্তমানে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। একদিকে এই আইনটি আদালত কর্তৃক "ভবঘুরে" হিসাবে ঘোষিত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে সাহায্য করা, তাদেরকে অস্থায়ী আশ্রয় প্রদান করা এবং যেসব অপরাধী চক্র দরিদ্রদেরকে ভিক্ষা বৃত্তিতে নিয়োজিত করে সেসব চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা।[২৮৪] অন্যদিকে আইনটি এতই অস্পষ্ট যে, যথেচ্ছভাবে যে কোন ব্যক্তিকে আটক এবং তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ কিংবা তাদেরকে "পুনর্বাসন" দেয়ার অজুহাতে দারিদ্র্য ও গৃহহীনতার শাস্তিস্বরূপ এই আইনটি ব্যবহৃত হতে পারে। এভাবে বিধিবদ্ধ আইন হিসেবে ভবঘুরে আইনটি ব্যক্তির অপরাধমূলক আচরণ বা কর্মকা-ের চেয়ে যেসব ব্যক্তি দরিদ্র ও গৃহহীন তাদেরকেই অপরাধী সাব্যস্ত করছে। এই আইনগুলো আন্তর্জাতিক মানদন্ডে সুরক্ষিত ন্যায্যতা ও আইনগত বৈধতার মৌলিক নীতিগুলোকে লঙ্ঘন করছে। আইনগত সিদ্ধতা অর্জনের জন্য একটি ফৌজদারী আইনকে প্রয়োজনীয় অভিপ্রায়সহ অভিযুক্তের সুনির্দিষ্ট আচরণকে লক্ষ্যবস্তু করা উচিত। মানবাধিকার মানদন্ডে ও আইনের শাসনে যা প্রয়োজন সেটি হলো, আইন হবে আগাম বোধগম্য ও পূর্বানুমানযোগ্য এবং সেখানে রাষ্ট্রের জন্য এমন বাধ্যবাধকতা থাকবে যাতে রাষ্ট্র সকল ফৌজদারী অপরাধগুলোকে সুস্পষ্টভাবে এবং স্বচ্ছ ও আগাম বোধগম্য পদ্ধতিতে ব্যাখা করবে।[২৮৫] উলেস্নখিত মানদন্ডগুলো ভবঘুরে আইনে পাওয়া যায় না।

---

[২৮৩] হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে, যিনি 'মাল্টি-সেক্টোরাল প্রোগ্রাম অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন' কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী টীমের একজন সদস্য (অনুরোধে নাম অপ্রকাশিত), ঢাকা, ৫ অক্টোবর ২০১১।

[২৮৪] ভেগরেন্সি এ্যাক্ট, ১৯৪৩ এর স্থলে ২০১১ সালের আইনটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

[২৮৫] আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের দুইটি ক্ষেত্রে 'সুনির্দিষ্টতা' প্রমাণের আবশ্যকতা রয়েছে। প্রথমত, এই সুনির্দিষ্টতা দন্ডবিধিতে অভিযুক্ত অপরাধীর চরিত্র বা আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন হয় (এটি একটি মতবাদ যাকে প্রায়শঃ আইসিসিপিআর-এর ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত "অস্পষ্টতার জন্য বাতিল" নীতি হিসাবে গণ্য করা হয়)। দ্বিতীয়ত, সুনির্দিষ্ট কিছু মৌলিক অধিকার ভোগে সীমাবদ্ধতা আরোপের ক্ষেত্রে এটির প্রয়োজন হয়। তবে এই আরোপিত সীমাবদ্ধতা অবশ্যই 'আইন' দ্বারা নির্দেশিত, আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা আইনের বিধান অনুযায়ী আরোপিত হতে হবে (যেভাবে আইসিসিপিআর-এর ১৭-২২ অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে)।

ভবঘুরে আইনটি ভিক্ষা বৃত্তিতে নিয়োজিত, নিরাশ্রয় এবং রাত্রে মাথা গোঁজার ঠাই নেই কিংবা সুনির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়া উদ্দেশ্যহীনভাবে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে জনসাধারণের বিড়ম্বনার কারণ হচ্ছে এমন সব ব্যক্তিকে ভবঘুরে হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[২৮৬] তবে দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় কারণে যারা খাদ্যদ্রব্য, আর্থিক সাহায্য কিংবা কোন উপহার গ্রহণ করে এবং উলেস্নখিত উদ্দেশ্যে সেগুলো ব্যবহার করে থাকে তাদেরকে এই আইনের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে।[২৮৭] ভবঘুরেমির শাস্তি হিসেবে কোন "পুনর্বাসন কেন্দ্র" দুই বৎসর পর্যন্ত আটক রাখা এবং এসব পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে তিন মাস পর্যন্ত কারাদ- দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।[২৮৮]

যেসব নারী পৃথক বসবাস বা তালাকের কারণে তাদের বৈবাহিক বাড়ী ছেড়ে যেতে বাধ্য হন তারা প্রায়শঃ আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সাথে থাকার ব্যবস্থা করেন, এবং শেষপর্যন্ত স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্য কোন বাসস্থানও হয়তো তারা পেয়ে যান। আবার কেউ কেউ রাস্তায় বসবাস ও ভিক্ষা করে। বিবাহিত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রাস্তায় জীবন যাপন করা কয়েকজন নারীর সাক্ষাৎকার হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ গ্রহণ করেছে।[২৮৯] তাদের মতো নারীরাও সহজে ফৌজদারী দন্ডের মুখোমুখি হতে পারে এবং তাদেরকে "পুর্নবাসন কেন্দ্র" আটকাদেশ দেওয়া হতে পারে।

সরকারের সমাজ সেবা বিভাগ ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো দেখাশুনা করে। হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ এই বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ভবঘুরে আইনের আওতায় নারীদের আটক থাকার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছে। নারী 'ভবঘুরেরা' যে এসব আশ্রয় কেন্দ্র আছে তা তারা নিশ্চিত করেছেন, তবে তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দিতে তারা নারাজ। তবে ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে তালাকপ্রাপ্ত ও পৃথক বসবাসকারী নারীদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয় কিনা সুনির্দিষ্টভাবে এমন প্রশ্ন করা হলে একজন কর্মকর্তা বলেন, "সে ধরনের ঘটনা দুর্লভ, তবে ঘটে থাকে। আমাদের কাছে এ ধরনের চার বা পাঁচটি ঘটনা থাকতে পারে।"[২৯০]

ম্যানফ্রেড নওয়াক, ইউএন কোভেন্যান্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস্: সিসিপিআর কমেন্ট্রি, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। (কেহ্ল এম রেইন: এঞ্জেল, ২০০৫), পৃষ্ঠা - ৩৬১।

[২৮৬] ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১, ধারা ২ (১৪)। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট এর অনারারি ডিরেক্টর এডভোকেট ও নারী অধিকার কর্মী সারা হোসেনের সাথে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ - এর ইমেইল যোগাযোগ, ঢাকা, ৭ অক্টোবর ২০১১; আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মেডিয়েশন এন্ড র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট - এর সিনিয়র ডেপুটি ডিরেক্টর নীনা গোস্বামীর সাথে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ - এর ইমেইল যোগাযোগ, ঢাকা, ২৫ মে ২০১১।

[২৮৭] পূর্বোক্ত।

[২৮৮] ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১, ধারা ১০ (৩)(খ) এবং ধারা ২২(১)(খ)।

[২৮৯] হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে তারা হলেন - অসীমা (ছদ্মনাম), মুসলিম, নোয়াখালী জেলা, ২০ মে ২০১১; জুবাইদা (ছদ্মনাম), মুসলিম, নোয়াখালী জেলা, ২০ মে ২০১১; ফাতিমা (ছদ্মনাম), মুসলিম, নোয়াখালী জেলা, ২০ মে ২০১১ এবং শেরিন (ছদ্মনাম), মুসলিম, নোয়াখালী জেলা, ২১ মে ২০১১।

[২৯০] ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্র নজরদারি ও পরিচালনা টীমের সাথে যুক্ত আছেন সমাজ সেবা বিভাগের এমন দু'জন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ গ্রহণ করেছে (তাঁদের অনুরোধে নাম এবং বিস্তারিত বিবরণ অপ্রকাশিত থাকলো)। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ - ৩ অক্টোবর ২০১১, ঢাকা।

সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি

বাংলাদেশে সামাজিক সহায়তার বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত কোন আইন নেই, তবে সামাজিক সহায়তামূলক বেশ কিছু কর্মসূচি আছে।[২৯১] ইউএনডিপির তথ্যমতে, "সামাজিক নিরাপত্তা জালের যে কোন কর্মসূচি দ্বারা অতি দরিদ্র ২৩% পরিবারের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়।[২৯২]

সামাজিক বহিস্থঃতার সকল সমস্যা বিদ্যমান থাকা সত্বেও উলেস্নখিত সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির কোন কোনটি অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জড়িত পৃথক বসবাসকারী ও তালাকপ্রাপ্ত নারীদের উপকারে এসেছে।[২৯৩] এ ধরনের সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির একটি হলো "বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ নারী"দের জন্য প্রতি মাসে ৩০০ টাকার একটি সরকারি আর্থিক ভাতা কর্মসূচি। অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কিত মাপকাঠিগুলো পূরণ করতে পারলে তারা এই আর্থিক ভাতাটি পেয়ে থাকে।[২৯৪]

পৃথকভাবে বসবাসরত ও তালাকপ্রাপ্ত নারীরা সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির সুবিধা কতটুকু গ্রহণ করছে সে বিষয়ে কোন সরকারি তথ্য নেই বললেই চলে। তবে এসব সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে, তা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নারী এবং সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি পরিচালনাকারী স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ -এর সাক্ষাৎকারগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে সচেতনতার অভাব, কর্মএলাকা বা উপকারভোগী নির্ধারণে বৈষম্য (অসম কাভারেজ) এবং তহবিলের অপব্যবহার প্রভৃতি। এছাড়া সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিগুলো শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, স্বামী কর্তৃক পরিত্যাগ এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের মতো পরস্পর সম্পর্কিত নাজুক অবস্থাগুলোকে গুরম্নত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়নি। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্ত্মবায়নের প্রধান

---

[২৯১] এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্ব এবং স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের জন্য সামাজিক সুবিধা প্রভৃতি। কর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মসংস্থানকেও সামাজিক নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। মোট ৩০টি বিভিন্ন সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির মধ্যে ৭টি কর্মসূচি দরিদ্র নারীদের সাহায্য সহায়তা কেন্দ্রিক। আরো তথ্যের জন্য দেখুন- ইউএনডিপি এবং পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেশন রিসার্স সেন্টার (পিপিআরসি) - এর "সোশ্যাল সেফটি নেটস্ ইন বাংলাদেশ, ভলিউম ১", ফেরম্নয়ারী ২০১২, http://www.undp.org.bd/info/pub/PPRC%20Social%20Safety%20Nets%20in%20Bangladesh.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ২২ মে ২০১২), পৃষ্ঠা ৩৮-৪২; সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, "বয়স্ক ভাতা", http://www.dss.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=59:old-age-allowences&catid=39:social-cash-transfer&Itemid=71 (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ২১ ফেব্রম্নয়ারী ২০১২)।

[২৯২] বাংলাদেশে ইউএনডিপি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন প্রিসনারের সাথে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ-এর ইমেইল যোগাযোগ, ঢাকা, ৩১ মে ২০১২।

[২৯৩] বাংলাদেশের সোশ্যাল সেফটি নেট স্কীমের উপর সাম্প্রতিক জরিপ বা গবেষণা প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে। তবে বিভিন্ন সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির বিস্ত্মারিত আলোচনা বা বিশেস্নষণ এই প্রতিবেদনের আওতা বহির্ভূত। এ বিষয়ে সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদনের জন্য দেখুন ইউএনডিপি এবং পিপিআরসি'র "সোশ্যাল সেফটি নেটস ইন বাংলাদেশ, ভলিউম - ১ এবং ২", ফেব্রম্নয়ারী ২০১২, http://www.undp.org.bd/info/pub/PPRC%Social%Safety%Nets%20in%20Bangladesh.pdf এবং http://www.undp.org.bd/info/pub/PPRC%Social%Safety%Nets%20Volume-2%20qxd.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ২২ মে ২০১২)।

[২৯৪] সমাজ সেবা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ; "বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের জন্য ভাতা", http://www.dss.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=62:allowences-for-widow-and-husbands-deserted-destitute-women&catid=39:social-cash-transfer&Itemid=71 (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ২২ ফেব্রম্নয়ারি ২০১২)। দেখুন ইউএনডিপি এবং পিপিআরসি'র "সোশ্যাল সিকিওরিটি নেটস ইন বাংলাদেশ, ভলিউম - ২", পৃষ্ঠা - ৬২। প্রত্যেক সুবিধাভোগী পাঁচ বছর সময়ের জন্য সহায়তা হিসেবে ১৮,০০০ টাকা পেতে পারেন।

চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও পূরণ সংক্রান্ত নানা সমস্যা, উপকারভোগী নির্ধারণে জটিলতা, নানা ছিদ্রপথ দিয়ে অর্থের অপচয়, এবং আঞ্চলিক বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য।"[২৯৫]

"পরিত্যক্ত" নারীদের জন্য প্রযোজ্য ভাতা পেতে পারতেন এমন অনেক নারী হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্‌কে বলেছেন, তারা কর্মসূচিটির বিষয়ে অবগত নন। এই কর্মসূচি থেকে তারা কেউই সরকারের কোন সহায়তা গ্রহণ করেন নি।

উদাহরণস্বরূপ, সামিরা বলেছিলেন, একটি শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু জন্ম দেওয়ার অপরাধে তার স্বামী তাদের বৈবাহিক বাড়ী থেকে তাকে বের করে দেন। পরবর্তীতে তারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান। সামিরা কিভাবে, কোথায় কাজ খুঁজে পেতে হয় তা জানেন না। কাজের সুযোগ পেলে তিনি তার শিশুকে ভালভাবে দেখভাল করতে পারতেন। তার স্বামী শিশুটির ভরণপোষণের কোন দায়িত্ব পালন করেনি। সামিরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-কে বলেছেন যে, তিনি কোন সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির বিষয়ে জানতেন না এবং এ ব্যাপারে কার কাছে যেতে হবে তাও জানা ছিলনা।[২৯৬]

নারীদের কয়েকজন বলেছেন, তারা কিছু সরকারি সহায়তা কর্মসূচি আছে সেকথা জানতেন। কিন্তু সেখানে সাহায্য চাইতে গেলে কয়েকটি প্রশ্নবিদ্ধ কারণে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বামী পরিত্যক্ত হওয়ার পর তৃষ্ণা এখন তার তিন বছরের কন্যাসহ বিধবা মায়ের উপর নির্ভরশীল জীবনযাপন করছে। তার মা গৃহস্থালী কাজ থেকে অতি সামান্য বেতন এবং অল্প কিছু বৃদ্ধ ভাতা পান। তৃষ্ণার একটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক শারীরিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে, ফলে তিনি কোন কাজ করতে পারেন না। একসময় তৃষ্ণা তাদের স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের কাছে গিয়ে সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা চালান। কিন্তু তারা তৃষ্ণাকে জানান যে, তার মা যেহেতু বৃদ্ধ-ভাতা পাচ্ছেন সেহেতু কোন সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি থেকে সাহায্য পাওয়ার সুযোগ তার নেই।[২৯৭]

স্পষ্টতঃই পারিবারিক আদালত হলো সেই জায়গা যেখানে নারীরা সামাজিক সহায়তার প্রয়োজনে ধরনা দিতে পারেন। কিন্তু যেভাবেই হোক এসব পারিবারিক আদালতকে সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির সাথে যুক্ত করার জন্য নিয়মমাফিক কোন প্রচেষ্টা এখনও দৃশ্যমান নয়। পারিবারিক আদালতে এখনও মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে ভুক্তভোগী এমন অনেক নারীর সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কথা বলেছে। এতে দেখা গেছে, তাদের কেউই স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের জন্য প্রযোজ্য ভাতার বিষয়টি জানেন না। আদালতের প্রশাসন এসব কর্মসূচির সাথে নারীদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া কিংবা কর্মসূচি সম্পর্কে মৌলিক কিছু তথ্য প্রদানের ব্যাপারে কোন কাজই করেনি। এই কাজটি যেমন করা উচিত তেমনি এসব প্রয়োজনীয় তথ্য যাতে

---

[২৯৫] পূর্বোক্ত।

[২৯৬] মাদারিপুর জেলার সমিরা (ছদ্মনাম), মুসলিম, তার সাথে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ - এর সাক্ষাৎকার; ২৯ মে ২০১১।

[২৯৭] ঢাকা জেলার বাসিন্দা তৃষ্ণা (ছদ্মনাম), মুসলিম, তার সাথে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ - এর সাক্ষাৎকার; ১৮ মে ২০১১, ঢাকা।

সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সংশিস্নষ্ট সবার কাছে পৌঁছানো যায় তার জন্য অন্যান্য সম্ভাব্য উপায়গুলোকেও সরকারের চিহ্নিত করা উচিত। বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্কুল, এনজিও অফিস এবং জাতীয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষের অফিসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার এই কাজটি করা যেতে পারে।

তথ্যপ্রাপ্তি সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতাগুলো ছাড়াও আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা এবং তহবিল অপব্যবহারের মাধ্যমেও সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির সুযোগ লাভ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। অর্থ-ভাতা সহায়তা কর্মসূচিটি ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের অনেকে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-কে বলেছেন, তারা হয়তো কোন্ কোন্ বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্ত নারীকে ভাতা দেওয়া হবে তার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু দেখা গেল ঐ অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মন্ত্রণালয় বেশ বিলম্ব করছে। ২০১১ সালের মে মাসে যখন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ -এর সাথে তাদের এই আলোচনা হচ্ছিল তখনও ২০১১ অর্থ বছরের ভাতা বিতরণ করা সম্ভব হয়নি।[২৯৮]

তহবিল ছাড়ের পর সেগুলো স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হলেও এসব তহবিল তৃণমূলের সবচেয়ে অভাবগ্রস্ত সদস্যদের কাছে পৌঁছাবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বাস্তবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তিন ডজনেরও অধিক সংখ্যক নারীর সাক্ষাৎকার (এককভাবে ও ছোট দলে বিভক্ত করে) গ্রহণ করেছে। এসব নারীরা জানিয়েছেন, নিজেদের সমাজের মধ্যে তারা এমন অনেক ঘটনা জানেন যেখানে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির সুবিধাভোগী হিসেবে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বেছে নেন। দরিদ্র সুবিধাভোগী কিভাবে নির্বাচন করা হবে তার জন্য কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় মাপকাঠি নির্ধারিত থাকলেও সবসময় সে নিয়ম মানা হয়না।[২৯৯]

ইউএনডিপির সহায়তায় বাংলাদেশে সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির উপর পরিচালিত সর্বসাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, আর্থিক ভাতা কর্মসূচির জন্য পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার আওতায় অর্জন হলো প্রায় ৩২ শতাংশ। তাছাড়া এই গবেষণা প্রতিবেদনে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ নারীদের আর্থিক ভাতা কর্মসূচিতে ২১ শতাংশ 'অন্তর্ভুক্তিসংক্রান্ত ভুল' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[৩০০] কর্মসূচির মধ্যেকার দুর্নীতির কিছু ফাঁক-ফোকরও প্রতিবেদনে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন, অনেক নারী বলেছেন কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণের জন্য তাদেরকে একটি বিধি বহির্ভূত ও অন্যায্য 'প্রবেশ ফি' প্রদান করতে হয়েছে। এই 'প্রবেশ ফি'র বোঝাটি দারিদ্র্য কবলিত জেলাগুলোতে উলেস্নখযোগ্য হারে বেশী। "সাহায্য ভাতার সীমিত সংখ্যক কার্ডের একটি পাওয়ার জন্য দরিদ্রদের মধ্যে যে কি তীব্র প্রতিযোগিতা কাজ করে প্রবেশ ফি সংক্রান্ত

---

[২৯৮] দুইজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের সাথে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ - এর সাক্ষাৎকার (তাঁদের অনুরোধে নাম এবং বিস্তারিত বিবরণ অপ্রকাশিত থাকলো), ২৩ মে ২০১১।

[২৯৯] আমিনা (ছদ্মনাম), মুসলিম, ঢাকা -এর সাথে ১৮ মে ২০১১ তারিখে এবং হেনা (ছদ্মনাম), মুসলিম -এর সাথে ২১ মে ২০১১ তারিখে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ -এর সাক্ষাৎকার। ১৮ জন নারীর সাথে ছোট দলে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ -এর গ্রুপ ইন্টারভিউ (স্থান প্রকাশ করা হলো না), ২১ মে ২০১১; আফরোজা (ছদ্মনাম), মুসলিম -এর সাক্ষাৎকার (স্থান প্রকাশ করা হলো না), ২২ মে ২০১১; ১৬ জন হিন্দু নারীর সাথে দলীয় আলোচনা বা সাক্ষাৎকার (স্থান প্রকাশ করা হলো না), ২২ মে ২০১১।

[৩০০] ইউএনডিপি এবং পিপিআরসি, "সোশ্যাল সেফটি নেটস্ ইন বাংলাদেশ, ভলিউম ২", ফেব্রুয়ারী ২০১২, http://www.undp.org.bd/info/pub/PPRC%Social%Safety%Nets%20Volume-2%20qxd.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ২২ মে ২০১২), পৃষ্ঠা - ৪৩ এবং ৫৬।

এই লেনদেনের ঘটনা থেকে তা প্রতীয়মান হয়।[৩০১] আর দারিদ্র্য কবলিত জেলাগুলোতে অর্থ হস্তান্তর স্কীমের এই 'প্রবেশ ফি'র পরিমাণ ছিল গড়ে ২০০০ টাকা। অথচ স্বল্প দারিদ্র্যপ্রবণ জেলাগুলোতে 'প্রবেশ ফি'র এই পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম, অর্থাৎ ১৫০০ টাকা।[৩০২]

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গৃহীত ভূমিকার ব্যর্থতাগুলো বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করে। পরিকল্পনা কমিশন বলছে, বাংলাদেশ সরকার ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে একটি "সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল" প্রণয়ন করবে।[৩০৩]

ভূমি বন্টন কর্মসূচি

অন্য আরেকটি রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্জনে তালাকপ্রাপ্ত ও পৃথক বসবাসকারী নারীদেরকে সাহায্য করতে পারে। সেটি হলো খাস জমি (সরকারের মালিকানাধীন) বন্টন কর্মসূচি। ভূমিহীন জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাকশন প্রোগ্রাম ১৯৮৭ -এর আওতায় এই কর্মসূচিটি চালু করা হয়। নারী প্রধান পরিবারগুলোও এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। তবে অধিকার কর্মীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-কে জানিয়েছেন যে, সরকারের নীতিমালা যেসব নারী প্রধান পরিবারে একজন সক্ষম পুরুষ আছে শুধুমাত্র সেসব পরিবারের মধ্যে এই খাস জমি বন্টনের সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে।[৩০৪]

নারী প্রধান পরিবারগুলোতে খাস জমি বন্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ঐ বৈষম্যটি দূর করার জন্য সরকারের কাছে বারবার আহ্বান জানানো হলেও উক্ত ভূমি বন্টন নীতি এখনও সংশোধনের অপেক্ষায় আছে।[৩০৫] এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেপলপমেন্ট নামক এনজিও'র পরিচালক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-কে বলেছেন, "নারী প্রধান পরিবারগুলো পুত্র সন্তান আছে শর্তে খাস জমি পাওয়ার অধিকারী হবে। আমরা এই বিষয়টি সরকারের কাছে তুলে ধরেছি। এটি যে একটি বৈষম্য এবং তা দূর করতে হবে সে ব্যাপারে সরকার নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এর কোন সংশোধন এখনও হয়নি।"[৩০৬]

---

[৩০১] ইউএনডিপি এবং পিপিআরসি, "সোশ্যাল সেফটি নেটস্ ইন বাংলাদেশ, ভলিউম ২, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০। দারিদ্র্য প্রবণ জেলাগুলোর শতকরা ৫০-৮০ জন নারী "প্রবেশ ফি" পরিশোধ করার কথা বলেছেন। তার তুলনায় কম দারিদ্র্য প্রবণ জেলাগুলোতে প্রবেশ ফি প্রদানকারী এই নারীদের সংখ্যা শতকরা ৭-২০ জন।

[৩০২] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬০।

[৩০৩] পরিকল্পনা কমিশন, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পৃষ্ঠা - ১৬৮।

[৩০৪] খুশী কবির, সমন্বয়কারী, নিজেরা করি, ঢাকা। তাঁর সাথে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ -এর সাক্ষাৎকার, ১৬ মে ২০১১।

[৩০৫] পূর্বোক্ত।

[৩০৬] এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভলপমেন্ট -এর নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদার সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ -এর সাক্ষাৎকার, ৩০ মার্চ ২০১১।

৬. আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা

বাংলাদেশ বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত বেশ ক'টি অলঙ্ঘনীয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ। এসব চুক্তির মধ্যে রয়েছে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন (সিডও)[৩০৭], সিডও'র অপশনাল প্রটোকল[৩০৮], নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর)[৩০৯], অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিইএসসিআর)[৩১০], প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক চুক্তি (সিআরপিডি)[৩১১], এবং বিবাহে সম্মতি, বিবাহের ন্যূনতম বয়স ও বিবাহ নিবন্ধন সংক্রান্ত চুক্তি।[৩১২] বেইজিং পস্ন্যাটফর্ম ফর এ্যাকশন[৩১৩], এবং জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ জে-ার সমতা বিধানে অন্য যেসব আন্তর্জাতিক মানদ- ও লক্ষ্য রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্যও বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।[৩১৪]

বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের সময় প্রযোজ্য সমানাধিকার

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন সম্পূর্ণভাবে বিবাহ এবং বিবাহ পরবর্তী সময়ে সাম্যের নিশ্চয়তা দেয়। সিডও'র ১৬ নং অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রের প্রতি এই বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছে যে, "বিবাহ এবং পারিবারিক সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রে" নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপে রাষ্ট্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। "বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন এবং এর পরিসমাপ্তির সময়েও রাষ্ট্র অনুরূপ সমানাধিকার ও দায়িত্বের প্রয়োগ" নিশ্চিত করবে।[৩১৫] সিডও'র কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আপত্তির কারণে যেসব অভিঘাত দৃশ্যমান হচ্ছে সেগুলো নীচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

---

[৩০৭] নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন (সিডও), ডিসেম্বর ১৮, ১৯৭৯ সালে গৃহীত, G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc.A/34/46, ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে সিডও সনদটি কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর সিডও সনদটি গ্রহণ করে। তবে বর্তমানে সিডও সনদের অনুচ্ছেদ ২ এবং ১৬(১)(সি) -এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আপত্তি রয়েছে। "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিজের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২, [...এবং ...] ১৬(১)(সি) মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আছে বলে মনে করেনা, কারণ এসব অনুচ্ছেদ পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ্ নির্ভর শরিয়াহ্ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।"

[৩০৮] নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন (সিডও)'র অপশন্যাল প্রোটোকল, ৬ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে গৃহীত, G.A. res. 54/4, annex, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 5, U.N. Doc.A/54/49 (Vol. I) (2000), কার্যকর হওয়ার তারিখ - ২২ ডিসেম্বর ২০০০। বাংলাদেশ ২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সিডও অপশন্যাল প্রোটোকলে অনুসমর্থন দেয়।

[৩০৯] নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর), ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে গৃহীত, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S.171, কার্যকর হওয়ার তারিখ - ২৩ মার্চ ১৯৭৬। বাংলাদেশ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে আইসিসিপিআর - এর সাথে যুক্ত হয়।

[৩১০] অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিইএসসিআর), ডিসেম্বর ১৬, ১৯৬৬ সালে গৃহীত, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, কার্যকর হওয়ার তারিখ - ৩ জানুয়ারি ১৯৭৬। বাংলাদেশ ১২ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে আইসিইএসসিআর - এর সাথে যুক্ত হয়।

[৩১১] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক চুক্তি (সিআরপিডি), ডিসেম্বর ১৩, ২০০৬ সালে গৃহীত, G.A. Res. 61/106, কার্যকর হওয়ার তারিখ ৩ মে ২০০৮। বাংলাদেশ ৩০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সিআরপিডি-তে অনুস্বাক্ষর করে।

[৩১২] বিবাহে সম্মতি, বিবাহের ন্যূনতম বয়স ও বিবাহ নিবন্ধন সংক্রান্ত চুক্তি।

[৩১৩] জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০, G.A. Res. 55/2, U.N. GAOR, 55th Sess., Supp. No. 49, at 4, U.N. Doc.A/55/49 (2000)।

[৩১৪] জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০, G.A. Res. 55/2, U.N. GAOR, 55th Sess., Supp. No. 49, at 4, U.N. Doc.A/55/49 (2000)।

[৩১৫] সিডও, অনুচ্ছেদ ১৬(১)(সি)।

আইসিসিপিআর এর ২৩ নং অনুচ্ছেদও "বিবাহ এবং এর পরিসমাপ্তিকালে" স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য সমতার নিশ্চয়তা দেয়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক সাম্য নয় বরং মৌলিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে সমতা নিশ্চিত করতে বাধ্য। সিডও কমিটির (সিডও'র বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্যে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ দল) ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর অর্থ হলো সরকার এমন একটি "উপযুক্ত পরিবেশ" সৃষ্টি করবে যার "ফলশ্রুতিতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে"।[৩১৬] সিডও কমিটির অভিমত হলো, রাষ্ট্র নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান জৈবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলোকেও আবশ্যিকভাবে বিবেচনায় নেবে, যাতে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।[৩১৭] প্রকৃত সাম্য অর্জনের লক্ষ্যে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো "বৈষম্যের শর্ত বা কারণগুলোকে দূরিভূত করার জন্য ইতিবাচক পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা" গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে 'বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা'র প্রয়োগও রাষ্ট্র বিবেচনা করতে পারে। এধরনের অগ্রাধিকারমূলক বিশেষ ব্যবস্থাকে বৈষম্য হিসেবে দেখা ঠিক হবেনা।[৩১৮] অন্যদিকে সিডও কমিটির অভিমত হলো, নারী-পুরুষের জন্য একই ধরনের কিংবা নিরপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক হতে পারে যদি এই ব্যবস্থা নারীর বিশেষাধিকার প্রাপ্তির গুরুত্বকে অস্বীকার করে। কারণ নারী যে ঐতিহাসিকভাবে আগে থেকেই বিরাজমান লিঙ্গ-বৈষম্য বা অপ্রাপ্তির শিকার হয়ে এসেছে বা এখনও হচ্ছে সেসব বিষয় তো উলেস্নখিত ব্যবস্থাগুলোতে স্বীকার করা হয়না।[৩১৯]

বিবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য জায়েজ করার জন্য রাষ্ট্র প্রচলিত ধর্ম বা প্রথার দোহাই দিতে পারে না। বিবাহের ক্ষেত্রে সমতার নীতি সম্পর্কিত এক স্বৈরতান্ত্রিক ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে সিডও কমিটির অভিমত হলো, একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আইনগত অনুশাসন, ধর্ম, প্রথা বা ঐতিহ্য যাই থাকুক না কেন পরিবারে আইনী ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রে নারীর প্রতি আচরণ অবশ্যই সব মানুষের জন্যে সাম্য ও ন্যায়বিচারের নীতির ভিত্তিতে হতে হবে।[৩২০] জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির (আইসিসিপিআর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ দল) সুপারিশ হলো, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, ঐতিহ্যগত কিংবা সাংস্কৃতিক বাধ্যবাধকতার দোহাই দিয়ে আইনের দৃষ্টিতে নারীর সমমর্যাদা ও সমসুযোগ প্রাপ্তির অধিকার

---

[৩১৬] নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিটি (সিডও কমিটি), সাধারণ সুপারিশ নং ২৫, Temporary special measures (2004), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II), পৃষ্ঠা - ৩৬৫, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(English).pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ২৭ আগস্ট ২০১১), অনুচ্ছেদ - ৮।

[৩১৭] পূর্বোক্ত।

[৩১৮] জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি, সাধারণ মন্তব্য নং ১৮, অনুচ্ছেদ - ১০।

[৩১৯] সিডও কমিটি, সাধারণ সুপারিশ নং ২৮; নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন, অনুচ্ছেদ ২ -এর আওতায় স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের মৌলিক বাধ্যবাধকতা (২০১০), CEDAW/C/2010/47/GC.2, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW-C-2010-47-GC2.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ৭ এপ্রিল ২০১২), অনুচ্ছেদ - ৫।

[৩২০] সিডও কমিটি, সাধারণ সুপারিশ নং ২১; বিবাহ এবং পারিবারিক সম্পর্কের সমতা, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II), পৃষ্ঠা - ৩৩৭, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom21 (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ২৭ আগস্ট ২০১১), অনুচ্ছেদ - ১৩।

যাতে লঙ্ঘিত না হয় এবং আইসিসিপিআর -এর আওতায় নির্ধারিত অন্যান্য সকল অধিকার যাতে নারীরা ভোগ করতে পারেন সে বিষয়টি রাষ্ট্র সুনিশ্চিত করবে।[৩২১] অধিকন্তু, সিডও'র অনুচ্ছেদ ৫(ক) রাষ্ট্রের জন্য আরও কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। সেগুলো হলো, নারী-পুরুষের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের ধারণা থেকে গড়ে ওঠা সকল ধরনের কুসংস্কার, প্রথাগত এবং অন্যান্য সব আচরণ দূরীকরণে নারী-পুরুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের ধারা পরিবর্তন করতে হবে। এছাড়া নারী-পুরুষের জন্যে নির্ধারিত আলাদা দায়িত্ব বা ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

বিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পারিবারিক আইনগুলো সাম্যের নিশ্চয়তা দেয়না। মানবাধিকারের মানদ-ে বিবাহ এবং পারিবারিক সম্পর্কে বৈষম্যহীনতা চর্চার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে বাংলাদেশের আইনের অনেক উপাদান তার সাথে সাংঘর্ষিক। নীচে আলোচিত সেসব বৈষম্যমূলক উপাদানের মধ্যে রয়েছে: বিবাহের বেলায় সম্পূর্ণ ও স্বাধীন মতের অনুপস্থিতি এবং বহুবিবাহের আইনগত স্বীকৃতি; তালাকের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের জন্য অসম মানদ-; তালাকের বেলায় বৈবাহিক সম্পত্তি দাবীর ক্ষেত্রে নারীর অক্ষমতা; ভরণপোষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা; বাধ্যতামূলক বিবাহ নিবন্ধন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক আইনের মানদ- প্রয়োগেও বাংলাদেশের ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যেসকল নারী বিশ্বাস করেন যে তাদের বিবাহ আইনগতভাবে বৈধ এবং তারা স্বামী-স্ত্রীরূপে একসাথে বসবাস করেছেন কিন্তু আদালতে বিবাহের বৈধতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন, সেসব নারীদের জন্য আইনী সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা বাংলাদেশের আইনগুলোতে রাখা হয়নি।

সিডও কনভেনশনে বাংলাদেশের সংরক্ষণ

সিডও কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২ এবং ১৬ তে বাংলাদেশ সরকার সংরক্ষণ রেখেছে। অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং ১৬ নং অনুচ্ছেদে বিবাহ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের অধিকার বিবৃত আছে। স্পষ্টতই উপরোক্ত ২ টি অনুচ্ছেদ দেশে বিদ্যমান শরীয়া আইনের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় বাংলাদেশ সরকার উক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে সংরক্ষণ রেখেছে। সিডও কমিটি উলেস্নখ করেছে যে, এ ধরনের সংরক্ষণ এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সে কারণে এটি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী এবং এ সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। সিডও কমিটি সংরক্ষণ প্রত্যাহারের জন্য বাংলাদেশকে বারবার অনুরোধ জানিয়ে এসেছে।[৩২২] বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে সিডও কমিটির কাছে প্রেরিত রিপোর্টে উলেস্নখ করেছে যে, "সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিষয়টি.....বিবেচনাধীন রয়েছে।"[৩২৩]

---

[৩২১] জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি, সাধারণ মন্তব্য নং ২৮, অনুচ্ছেদ - ৫।

[৩২২] সিডও কমিটি, "নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কমিটি, বাংলাদেশ -এর সমাপনী পর্যবেক্ষণ", ৪৮তম অধিবেশন, জানুয়ারী ১৭ - ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১১, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/417/30/PDF/G1141730.pdf?OpenElement (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ৫ ডিসেম্বর ২০১১), অনুচ্ছেদ ১১; সিডও কমিটি, "নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কমিটি, বাংলাদেশ -এর সমাপনী পর্যবেক্ষণ", ৩১তম অধিবেশন, জুন ২০০৪, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/BangladeshCO31.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ৫ ডিসেম্বর ২০১১), অনুচ্ছেদ ২৩৬।

[৩২৩] স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের সমন্বিত ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিওডিক প্রতিবেদন; সিডও অনুচ্ছেদ ১৮ -এর আওতায় স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের পেশকৃত প্রতিবেদন বিবেচনা, CEDAW/C/BGD/6-7, মার্চ ২০১০, http://daccess-dds-

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি মানবাধিকার সম্পর্কিত চুক্তিসমূহে সংরক্ষণের সুযোগ থাকার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কমিটি উলেস্নখ করেছে যে, সংরক্ষণের সুযোগটি ভিয়েনা কনভেনশনের চুক্তি সংক্রান্ত আইনের অধীন। এই আইনের অনুচ্ছেদ ১৯(৩) বলে কোন সংরক্ষণই কোন চুক্তির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের সাথে সংঘাতপূর্ণ হতে পারবে না।[৩২৪] এর অর্থ হলো যে সমস্ত সংরক্ষণ প্রচলিত নীতি এবং আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনের সাথে সংঘাতপূর্ণ সে সমস্ত অনুচ্ছেদ 'সংরক্ষণ' করা যাবে না। অনুরূপভাবে চুক্তির মধ্যে অধিকারকে শ্রদ্ধা এবং নিশ্চিতকরণের বাধ্যবাধকতা কিংবা চুক্তিতে বর্ণীত অধিকারকে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বাধ্যবাধকতার প্রতি সংরক্ষণ আরোপ করা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় (যেমনটা বাংলাদেশের আরোপিত সংরক্ষণে প্রতীয়মান হচ্ছে)।[৩২৫] এই কমিটি বাংলাদেশের মতো অনুরূপভাবে আরোপিত সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ এ ধরনের সংরক্ষণ ব্যাপক হারে সুসংগঠিত এবং বাস্তবিক অর্থে যেসব অধিকার ভোগ করার জন্য জাতীয় আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের আবশ্যকতা থাকে সেসব অধিকারকে এ ধরনের সংরক্ষণ অকার্যকর করে দেয়।[৩২৬]

বহুবিবাহ

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি উলেস্নখ করেছে যে, "বহুবিবাহ নারীর মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে" এবং নিঃসন্দেহে এটি একটি "নারীর প্রতি চূড়ান্ত বৈষম্য" যা "যেখানেই ঘটে থাকুক না কেন নির্মূল করা দরকার"।[৩২৭] সিডও কমিটিও বলেছে -

> বহুবিবাহ পুরুষের অনুরূপ নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং এ ধরনের বিবাহ নারীর প্রতি এবং নারীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পক্ষে চরম মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। সে কারণে এ ধরনের বিবাহ নিরুৎসাহিত ও নিষিদ্ধ করা উচিত।[৩২৮]

বাংলাদেশের পারিবারিক আইনে মুসলিম এবং হিন্দু পুরুষের বহুবিবাহ অনুমোদিত। এই আইন দ্বারা নারীর সমঅধিকার ক্ষুন্ন হয়। যখন একজন পুরুষ তার বর্তমান বৈবাহিক অবস্থার কথা গোপন রাখে এবং পুনঃবিবাহ করে তখন বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীদের সম্পূর্ণ এবং স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারটিও (যে অধিকার সিডও, আইসিসিপিআর এবং অন্যান্য চুক্তি দ্বারাও সংরক্ষিত) লঙ্ঘিত হয়।[৩২৯]

---

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/288/51/PDF/N1028851.pdf?OpenElement (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ৫ ডিসেম্বর ২০১১), অনুচ্ছেদ ৬৮।

[৩২৪] সাধারণ মন্তব্য নং ২৪: চুক্তি (Covenant) বা তার অপশনাল প্রোটোকলে অনুস্বাক্ষর করা বা যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি, কিংবা চুক্তির অনুচ্ছেদ ৪১ এর অধীনে প্রদত্ত ঘোষণা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, ১১ এপ্রিল ১৯৯৪, অনুচ্ছেদ ৬, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), পৃষ্ঠা ২১০।

[৩২৫] পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ ৮ এবং ৯।

[৩২৬] পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ ১২।

[৩২৭] জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি, সাধারন মন্তব্য নং ২৮, অনুচ্ছেদ ২৪।

[৩২৮] সিডও কমিটি, সাধারন সুপারিশ নং ২১, অনুচ্ছেদ ১৪।

[৩২৯] সিডও, অনুচ্ছেদ ১৬(ন); আইসিসিপিআর, অনুচ্ছেদ ২৩(৩); আইসিইএসসিআর, অনুচ্ছেদ ১০(১)।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশে পুরুষের বহুবিবাহের কারণে অনেক ক্ষেত্রে নারীর প্রতি পারিবারিক নির্যাতনের প্রমাণ পেয়েছে, যা নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত প্রচেষ্টার ব্যাপারে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যেমন, স্বামীর পুনঃবিবাহের ক্ষেত্রে আইনগত পূর্বশর্তগুলো মেনে চলার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা কার্যকর করতে বাংলাদেশ সরকার ব্যর্থ হয়েছে। আইন প্রয়োগে এই ব্যর্থতা পারিবারিক নির্যাতন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। ১৯ এবং ২৮ নং সাধারণ সুপারিশে সিডও কমিটি জোরালোভাবে বলেছে যে, যদি রাষ্ট্র অধিকার লংঘনের ঘটনা রোধকল্পে যথাযথ তৎপরতার সাথে অপরাধের তদন্ত করতে এবং সহিংসতার অপরাধের যথাযথ বিচার ও শাস্তি নিশ্চিতকরণে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত কার্যকলাপের জন্য রাষ্ট্রকেই দায়ী হতে হবে।[৩৩০]

তালাকের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের জন্য অসম বিধান

বিবাহের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার এবং বিবাহের 'পরিসমাপ্তি'কালে পুরুষের চাইতে নারীর আইনগত বাধা যাতে বেশি না হয় তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

যে সকল আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমোদন রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে মূলতঃ মুসলিম ও খ্রিস্টান নারীরা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার চর্চার বেলায় পুরুষের চাইতে বেশি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। *তালাকের* মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর পূর্ণ অধিকার মুসলিম পুরুষদের রয়েছে। কিন্তু একজন মুসলিম নারী কেবলমাত্র তখনই তালাক দিতে পারবেন যদি তার স্বামী বিবাহের চুক্তিপত্রে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষমতার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। মুসলিম নারীরা অবশ্য *মুবারা'ত* (যখন দু'পক্ষই সম্মতি দেন) অথবা *খুলা* (যখন স্ত্রী বিচ্ছেদের দাবী করেন এবং স্বামী তাতে সম্মতি দেন) এর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। কিন্তু অনেকের মতে, খুলা প্রথার অধীনে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীদেরকে কিছু ছাড় (সাধারণত টাকা অথবা *মোহরানার* দাবী) দিতে হয়। এই ছাড় মূলতঃ হয়ে থাকে বিবাহ বিচ্ছেদে স্বামীর সম্মতি আদায়ের জন্য। তবে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মুসলিম নারীরা আদালতেরও দ্বারস্থ হতে পারেন। তখন মুসলিম বিবাহ আইনের আওতায় বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপের সুযোগ ঘটে এবং সে প্রক্রিয়াটি সাধারণত হয়ে থাকে বেশ ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। আর আইনটি বিবাহ বিচ্ছেদ সংশিস্নষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং সেই পরিস্থিতি সাধারণত নারীদের অনুকূল হয়না।

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের অধীনে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। এই আইনে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের অভিযোগে সহজেই পরিত্যাগ করতে পারেন। তবে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করতে চাইলে তাকে বেশ কিছু কঠিন শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

---

[৩৩০] সিডও কমিটি, অনুচ্ছেদ ২ -এর অধীনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মৌলিক বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত সাধারণ সুপারিশ নং ২৮, অক্টোবর ২০১০, CEDAW/C.2010/47/GC.2, প্যারা - ১৯।

বৈবাহিক সম্পত্তির আইনগত স্বীকৃতির অভাব

বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের সময়ে নারীর সমঅধিকার বলতে বৈবাহিক সম্পত্তিতে তার অধিকারের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। সিডও কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১৬ তে বলা হয়েছে, 'সম্পত্তির মালিকানা, সম্পত্তি অর্জন, এর ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ভোগদখল এবং হস্তান্তরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই সমঅধিকার রয়েছে' যা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে।[৩৩১]

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির মতে, বিবাহে সমতা মানে হলো 'বিবাহের পর সকল ক্ষেত্রে' সমতা, যার মধ্যে 'সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা'ও অন্তর্ভুক্ত। বৈবাহিক সম্পর্কের অধীনে 'সম্পত্তির মালিকানা অথবা ব্যবস্থাপনায়' স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সমঅধিকার এবং দায়বদ্ধতা রয়েছে যা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে, তা সে সম্পত্তি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কিংবা তাদের যে কোন একজনের মালিকানাধীন, যে ধরনেরই হোক না কেন। এ জাতীয় সম্পত্তির মালিকানা লাভ এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে বিবাহিত নারীদের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে সংশিস্নষ্ট আইনগুলো পর্যালোচনা করে দেখার জন্য জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।[৩৩২]

আইসিইএসসিআর -এর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণকারী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি (সিইএসসিআর)ও অভিমত দিয়েছে যে, বৈবাহিক সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার রাষ্ট্রের সরকারগুলোকেই নিশ্চিত করতে হবে।[৩৩৩]

সামাজিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, স্বামীরাই তাদের স্ত্রীদের দায়দায়িত্ব বহন করে এবং সে কারণে বৈবাহিক সম্পত্তিতে নারীদের সমঅধিকার প্রদান অনুচিত, সিডও কমিটি এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পুরুষ তার পরিবারের নারী ও সন্তানদের দায়িত্ব বহন করে এই যুক্তিতে বৈবাহিক সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত না করা বৈষম্যমূলক।[৩৩৪] যদিও অনেক দেশ বিবাহ বিচ্ছেদের সময় বৈবাহিক সম্পত্তি দম্পতিদের মধ্যে বন্টন করে থাকে তারপরও এই কমিটি উলেস্নখ করতে চায় যে, ঐ দেশসমূহ বিবাহিত নারীর শুধুমাত্র আর্থিক অবদানকে বিবেচনায় রাখে। ফলে আর্থিক নয় এমন অবদানগুলো তাদের বিবেচনা থেকে বাদ পড়ে যায়।[৩৩৫] রাষ্ট্রের উচিত নারীর আর্থিক এবং অর্থ-সংশিস্নষ্ট নয় (যেমন শিশুদের লালন-পালন, বয়োজ্যেষ্ঠদের যত্ন নেওয়া, সংসারের অন্যান্য দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন) এমন সব ধরনের অবদানকে সমান গুরত্ব দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের সময় বৈবাহিক সম্পত্তি বন্টন করা।[৩৩৬]

---

[৩৩১] সিডও, অনুচ্ছেদ ১৬(১)(য)।

[৩৩২] জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি, সাধারণ মন্তব্য নং ২৮, অনুচ্ছেদ ২৫।

[৩৩৩] অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটি, সাধারণ মন্তব্য নং ১৬, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার, E/C.12/2005/4, 2005, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/435/39/PDF/G0543539.pdf?OpenElement (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ২৭ আগস্ট ২০১১), অনুচ্ছেদ ২৭।

[৩৩৪] সিডও কমিটি, সাধারণ সুপারিশ নং ২১, অনুচ্ছেদ ২৮।

[৩৩৫] পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ ৩০-৩৩।

[৩৩৬] পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ ৩২।

বাংলাদশের আইন নারীর আলাদা করে সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত না করে বরং বৈবাহিক বাড়ী এবং স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর সব ধরনের অবদানকে উপেক্ষা করে থাকে। ২০১০ সালের পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে 'অর্থনৈতিক ক্ষতি'র ধারণাকে এবং বৈবাহিক বা অংশীদারী বাড়ীতে স্ত্রীর অবদানের সংক্রান্ত কিন্তু গুরন্নত্বপূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে অন্য কোন আইনে দাম্পত্য জীবন যাপনকালে বৈবাহিক সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার কিংবা দাম্পত্য সম্পর্ক পরিসমাপ্তির সময় এসব সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকারের কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা নেই।[৩৩৭] 'মোহর' হচ্ছে নারীর একমাত্র স্বীকৃত সম্পত্তির অধিকার যা বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইনে বর্ণিত আছে। মোহরের অর্থ একটি আর্থিক প্রতিশ্রন্নতি যা বিবাহের চুক্তির সময়ে স্বামী কর্তৃক প্রতিশ্রন্নত হয়ে থাকে। বাস্ত্মবে পুরন্নষ প্রায় সবসময় বৈবাহিক সম্পর্কের পরে অর্জিত বাড়ী, ভূমি এবং অন্যান্য সম্পত্তির মালিক হয়। যদিও ঐ সম্পত্তি অর্জনে নারীর প্রচুর অবদান থাকে তথাপি বিবাহ বিচ্ছেদের সময় পুরন্নষই সকল সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে। বৈবাহিক সম্পত্তি বিষয়ে যথাযথ আইন না থাকার কারণে বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার লঙ্ঘিত হয়, যা নারীর মানসম্মত জীবন যাপনের অধিকারকেও ব্যাহত করে।[৩৩৮] এই আইনী অভাব নারীর মানসম্মত বাসস্থান প্রাপ্তির অধিকারের উপরও প্রভাব ফেলে। কারণ বিবাহ বিচ্ছেদের পরে নারীকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয়। ফলে যে ধরনের জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত্ম ছিলেন বিবাহ বিচ্ছেদের পর তার চেয়ে নিম্ন-মানের বাসস্থানে জীবন যাপন করতে তিনি বাধ্য হন।

চুক্তির শর্ত পূরণে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কিত সর্বশেষ রিভিউ -এর সময় সিডও কমিটি বিবাহ বিচ্ছেদকালে বৈবাহিক সম্পত্তির বন্টন সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। কমিটির পরামর্শ হলো - বাংলাদেশের উচিত হবে "এসব ক্ষেত্রে এবং এমনকি পারিবারিক আইনের কঠিন অনুশাসনের পরিস্থিতিতেও নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রগতিশীল আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা"। এই কমিটি আরও সুপারিশ করেছে যে, "বিবাহ সম্পর্কিত সকল অর্থনৈতিক ফলাফল বা পরিণতিগুলোকে দেওয়ানী চুক্তির অধীনস্থ বিষয় হিসেবে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা দরকার এবং বৈবাহিক সম্পত্তিতে অংশীদারিত্বের ধারণাটিকেও 'পরোক্ষ চুক্তি'র তত্ত্ব থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে সকল প্রকার বিবাহের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায়"।[৩৩৯]

---

[৩৩৭] পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, ধারা ১০ এবং ১৫।

[৩৩৮] আইসিইএসসিআর, অনুচ্ছেদ ১১, এর সাথে পড়ুন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটির সাধারণ মন্তব্য নং ১৬, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরন্নষের সমঅধিকার (অনুচ্ছেদ ৩, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি), ২০০৫, E/C.12/2005/4, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/435/39/PDF/G0543539.pdf?OpenElement (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ৭ এপ্রিল ২০১২), এবং দেখুন - সাধারণ মন্তব্য নং ২০, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা (অনুচ্ছেদ ২, প্যারা ২, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি), ২০০৯, E/C.12/GC/20,http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ৭ এপ্রিল ২০১২)।

[৩৩৯] সিডও কমিটি, "চুক্তির ১৮ নং অনুচ্ছেদের আওতায় সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পেশকৃত প্রতিবেদনের উপর বিবেচনা, বাংলাদেশের সমন্বিত ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিওডিক প্রতিবেদন", অনুচ্ছেদ - ৫১।

ভরণপোষণ আদায়ের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোতে দম্পতির ভরণপোষণের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বিশেস্নষণ না থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে, বিবাহ এবং এর পরিসমাপ্তিতে নারী যাতে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় সে অধিকার নিশ্চিত করতে তার ভরণপোষণ প্রাপ্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরন্নত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সব দেশে নারীর প্রতি সমাজের এক ধরনের প্রত্যাশা থাকে যে, নারী তার ক্যারিয়ার এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে পরিবার এবং গৃহস্থালীর দায়িত্বের নীচে স্থান দেবে। নারীর আয়মূলক কাজকে কখনও কখনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা না গেলেও বিবাহ প্রায় সময়েই তার আয় এবং ক্যারিয়ারের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। দাম্পত্য জীবনের পুরোটা সময় জুড়ে নারী সবসময় পুরন্নষের চেয়ে দেড় বেশী গৃহস্থালীর কাজ এবং পরিবারের সেবাযত্নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাদের এ অবদান প্রায় সময় স্বামীর ক্যারিয়ারের অগ্রগতি, পারিবারিক ব্যবসার উন্নতি এবং পরিবারের সার্বিক মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বিবাহ এবং বিবাহের পরিসমাপ্তির সময় নারী ও পুরন্নষ যাতে সমঅধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্য কিছু বাস্তব বিষয়কে সংশিস্নষ্ট আইনে স্বীকার করে নেয়া জরন্নরি। সেগুলো হলো, বিবাহ নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে, বিবাহের পরিসমাপ্তিতে পুরন্নষের তুলনায় অনেক কম সম্পত্তি এবং অর্থনৈতিক সুযোগ নারীর জন্য বরাদ্ধ রাখা হয়, ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে নারীর জন্য বিশেষ আইনী রক্ষাকবচ থাকতে হবে। দাম্পত্য জীবনে পরিপালিত বিভিন্ন দায়িত্ব ও ভূমিকাকে বিবেচনায় নিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য যাতে সমান আর্থিক অবস্থা নিশ্চিত করা যায়, ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইনটি সেরকই হওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে ভরণপোষণ বিষয়ে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যার অভাব থাকলেও সংশিস্নষ্ট জাতিসংঘ কমিটি এ সংক্রান্ত আইনের গুরন্নত্ব সম্পর্কে মতামত তুলে ধরার পাশাপাশি এসব আইনকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কারকে উৎসাহিত করেছে। বৈষম্যহীনতা যাতে এসব আইনের সেবা বা সুযোগ লাভের মূল ভিত্তি হয়, সে বিষয়েও কমিটি তার ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির অভিমত হলো, আইসিসিপিআর এর ২৩ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে "স্ত্রীকে ভরণপোষণ এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত খোরপোশ প্রদানের ক্ষেত্রে .... পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনুসৃত বৈষম্যমূলক আচরণকে" নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৩৪০] সিডও কমিটিও স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহকে ভরণপোষণ আইন সংস্কারের তাগিদ দিয়েছে, যাতে করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরাজমান জেন্ডার সংশিস্নষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অবৈতনিক কাজে নারীর ব্যাপক সংশিস্নষ্টতার মতো বিষয়গুলোর প্রতিফলন উক্ত আইনগুলোতে পাওয়া যায়।[৩৪১]

---

[৩৪০] জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি, সাধারণ মন্তব্য নং ১৯, প্যারা - ৯।

[৩৪১] দেখুন সিডও কমিটি, জার্মানির উপর সমাপনী পর্যবেক্ষণ, CEDAW/C/DEU/CO/6, 2009, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-DEU-CO6.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ৭ এপ্রিল ২০১২), প্যারা - ৫৫।

সিডও কমিটির সদস্যরা একটি মামলার রায় প্রদানের সময়ও ভরণপোষণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একজন তালাকপ্রাপ্ত নারী সিডও অপশনাল প্রটোকলের অধীনে উক্ত মামলা দায়ের করেন।[৩৪২] স্থানীয় আইনের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবহিত না থাকার কারণে মামলাটি বাতিল করা হয়। তবে কমিটির দু'জন সদস্য মামলার পরিণতির ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে স্থানীয় আদালতের বিবেচনা করা উচিত ছিল এমন কিছু বিষয় বা বিচারিক মানদ- বাতলে দিয়েছেন। তাদের পর্যবেক্ষণ ছিল এরকম : স্থানীয় আদালত একটি 'যথোচিত' মাত্রার ভরণপোষণ নির্ধারণ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, আদালতের উচিত ছিল স্বামীর উপার্জন এবং ক্যারিয়ারের উন্নতির সময় তার পরিবারে স্ত্রী যেভাবে বছরের পর বছর ধরে অবৈতনিক কাজের মাধ্যমে অবদান রেখে গেছেন সেগুলোকে বিবেচনায় নেয়া। এছাড়া তার অনিশ্চিত অর্থনৈতিক অবস্থা, বাইরে কাজ করার ব্যাপারে তার অনভিজ্ঞতা, বয়সের কারণে কাজ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কিংবা নিজের ভরণপোষণের ভার বহনের সামর্থ্য আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ও স্থানীয় আদালতের বিবেচনা করা উচিত ছিল বলে তারা মনে করেন। এই সকল মানদ-ের সাথে ভরণপোষণ নির্ধারণের বিষয়ে ক্যারিবিয়ান কমিউনিটির আরও বিস্তৃত পরিসরে তৈরি তালিকার যথেষ্ট মিল রয়েছে (চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে)।

ভরণপোষণের বিষয়ে বাংলাদেশের পারিবারিক আইনে যা বলা আছে তা খুবই অস্পষ্ট। সুনির্দিষ্ট মানদ- না থাকার কারণে আদালত কিংবা প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলো ভরণপোষণ নির্ধারণে মানসম্মত কোন নিয়ম বা পদ্ধতি যে অনুসরণ করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, স্ত্রীকে দেওয়া ভরণপোষণের পরিমাণ প্রায় ক্ষেত্রে অতি সামান্য হয়ে থাকে এবং বিবাহের পরিসমাপ্তিকালে নারী-পুরুষের যে অসম আর্থিক অবস্থা তা সংশোধন করা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনা।

অধিকন্তু, বাংলাদেশে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যাপারে দায়েরকৃত মামলাগুলোর নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া যথারীতি দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ হয়ে থাকে। প্রায়শঃ দেখা যায় এসব মামলা যুগের পর যুগ ধরে চলছে। ফলে দাম্পত্য জীবনের পরিসমাপ্তিতে অর্থনৈতিক সহায়তা লাভের জন্য বিবাহিত নারীদের দায়েরকৃত মামলাগুলো বাস্তবে অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ ধরনের মামলা নিষ্পত্তিতে পারিবারিক আদালতসমূহ যাতে একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে চলে তা বাংলাদেশ সরকার এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি। কিংবা দায়েরকৃত মামলার সর্বশেষ রায় না আসা পর্যন্ত অন্ততঃপক্ষে অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে স্ত্রীর ভরণপোষণ পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করা যায়নি। অন্যান্য দেশে, যেমন পাকিস্তানে, এই সমস্যার সমাধান ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। মামলা চলাকালীন অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবে - এ ধরনের নিয়ম প্রবর্তনের মাধ্যমে পাকিস্তানে এই বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হয়েছে।[৩৪৩]

---

[৩৪২] *Ms. B-J v. Germany*, Communication No.: 1/2003, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত, সিডও অপশনাল প্রটোকলের আওতায় আনীত একটি প্রস্তাব/মামলাকে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা, ২০০৪ সালের ১৪ জুলাই ৩১তম অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

[৩৪৩] পাকিস্তানের পারিবারিক আদালত আইন, ১৯৬৪, ধারা ১৭অ; মালয়েশিয়ার মুসলিম পারিবারিক (ফেডারেল টেরিটোরিজ) আইন, ১৯৮৪, ধারা ৭০; মরক্কো এবং মালয়েশিয়াও অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ প্রদান করে থাকে।

বিবাহ নিবন্ধন

বিবাহে সম্মতি, বিবাহের ন্যূনতম বয়স এবং বিবাহ নিবন্ধন সংক্রান্ত চুক্তি "যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সরকারি রেজিস্টারের মধ্যে সকল বিবাহের নিবন্ধন নিশ্চিত করার" জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে।[৩৪৪]

তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিবাহ নিবন্ধন একটি জটিল প্রক্রিয়া। সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য এই বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলকও নয়। খ্রিষ্টান এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে বিবাহ নিবন্ধন করতে হবে ঠিকই, কিন্তু সেক্ষেত্রে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর রেকর্ড সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। বিবাহের নথিপত্রে রদবদল, বিশেষত মুসলিমদের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা, যা সরকার এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। হিন্দু জনগোষ্ঠীর বেলায় বিবাহ নিবন্ধনের আদৌ কোন ব্যবস্থা নেই। তবে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা ২০১২ সালের মে মাসে হিন্দু বিবাহের ঐচ্ছিক নিবন্ধনের একটি বিল অনুমোদন করেছে।

স্বীকৃত নয় এমন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান

উপরে আলোচিত বিবরণ অনুসারে, বাংলাদেশে এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে নারীরা পুরুষের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখে এই বিশ্বাসে যে, তারা বিবাহিত। যখন পুরুষটি সম্পর্ক ভাঙতে চায় একমাত্র তখনই নারীরা বুঝতে পারে যে, আইন অনুযায়ী তাদের বিবাহ হয়নি কিংবা এই বিবাহের বৈধতা প্রমাণের জন্য কোন আইনগত তথ্য প্রমাণাদি তাদের হাতে নেই।

মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন 'পরিবার' এর ধারণাকে বেশ নমনীয় অর্থে গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘের চুক্তি সংক্রান্ত কমিটিগুলো বিভিন্ন পারিবারিক পরিস্থিতিতে পরিবার সম্পর্কিত সব অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে উৎসাহিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আইসিসিপিআর -এর ২৩ নং অনুচ্ছেদের (যে অনুচ্ছেদ পরিবার, বিবাহ এবং দম্পতির সমানাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়) উপর পেশকৃত সাধারণ মন্তব্যে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি বলেছে, একক পিতা-মাতা এবং তাদের সন্তানাদিসহ বিভিন্ন ধরনের পরিবারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহের নৈতিক দায় বা বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এসব পরিস্থিতিতে নারীদের জন্য সমঅধিকার ও সমআচরণ নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।[৩৪৫]

বাংলাদেশে কোন কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে একটি বৈধ বিবাহ বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট মানদণ্ড-র অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে সঠিক ধারণার অভাব এবং বিবাহ নিবন্ধন ব্যবস্থার দুর্বল প্রয়োগের কারণে অনেক দম্পতি নিজেদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বলে মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়,

---

[৩৪৪] বিবাহে সম্মতি, বিবাহের নূন্যতম বয়স এবং বিবাহ নিবন্ধন সংক্রান্ত চুক্তি, ৭ নভেম্বর ১৯৬২ সালে গৃহীত, G.A. res. 1763 (XVII), কার্যকর হওয়ার তারিখ - ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৪, http://www2.ohchr.org/english/law/convention.htm (সর্বশেষ দেখা হয়েছে - ১৭ আগষ্ট ২০১১), অনুচ্ছেদ ৩। বাংলাদেশ ৫ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে এই কনভেনশন গ্রহণ করে।

[৩৪৫] জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি, সাধারণ মন্তব্য নং ১৯, প্যারা ২।

তারা আসলে বিবাহের কোন আইনগত শর্তই পূরণ করেননি। যেসব নারী এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হন তারা পারিবারিক আইনের আওতায় ভরণপোষণ বা অন্য কোন ধরনের নিরাপত্তা লাভের অধিকারী হন না, সে ভরণপোষণ বা নিরাপত্তা যত অকিঞ্চিতকরই হোক না কেন। বাংলাদেশের উচিত বিবাহের আইনী শর্ত পূরণে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি কি পরিস্থিতিতে বৈবাহিক এবং পারিবারিক অধিকারের দাবী উত্থাপন করতে পারে তা নির্ধারণে বিচারকদের জন্য স্বচ্ছ দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করা। আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতি বিধান করার জন্যই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার

সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বহুবিধ মানবাধিকার চুক্তি অনুমোদন করেছে। আইসিইএসসিআর এর ৯ নং অনুচ্ছেদে 'সামাজিক বীমাসহ প্রত্যেকের সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার' স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সিডও কনভেনশনের ১১(ই) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নারীদের জন্য 'বিশেষ করে যারা বেকার, অসুস্থ, অক্ষম এবং বয়স্ক কিংবা অন্যান্য কারণে যাদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে গেছে' তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[৩৪৬] অন্যদিকে অনুচ্ছেদ ১৪(সি) বলছে, সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচি থেকে গ্রামীণ নারীরা সরাসরি উপকৃত হবেন - এটাই প্রত্যাশিত।[৩৪৭] সিআরপিডি এর ২৮ নং অনুচ্ছেদ শারীরিক প্রতিবন্ধী, বিশেষত নারী এবং কিশোরীদের প্রতি, সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। বিশেষ করে, প্রতিবন্ধী রয়েছে এমন দরিদ্র পরিবার প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানকারী কর্মসূচির সুবিধা যাতে গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে এই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রসমূহের প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।[৩৪৮]

সিইএসসিআর এর সাধারণ মন্তব্য নং ১৯ এ বলা হয়েছে, 'অপর্যাপ্ত পারিবারিক সহযোগিতা' থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য অর্থ কিংবা অন্যান্য সম্পদ লাভের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার অধিকার সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।[৩৪৯] এখানে বলা হয়েছে 'যুৎসই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে বা তাকে ধরে রাখতে না পারার কারণে যে আয়হীনতা বা ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়, সেটিকে পুষিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ বা উপার্জনের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব'।[৩৫০] সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার সব নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য হলেও প্রধানত নারী, শিশু, নির্ভরশীল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, এবং বয়োঃবৃদ্ধসহ নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের প্রতি 'বিশেষ মনোযোগ' দেওয়ার জন্য সিইএসসিআর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।[৩৫১] কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা এবং পারিবারিক দায়-দায়িত্বের কারণে যে সকল নারী সমাজে ভূমিকা রাখতে পারেন না,

---

[৩৪৬] সিডও, অনুচ্ছেদ - ১১(ব)।

[৩৪৭] পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ - ১৪(প)।

[৩৪৮] সিপিআরডি, অনুচ্ছেদ - ২৮।

[৩৪৯] অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটি, সাধারণ মন্তব্য নং ১৯, প্যারা - ২।

[৩৫০] পূর্বোক্ত, প্যারা - ১৬।

[৩৫১] অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটি, সাধারণ মন্তব্য নং ১৯, প্যারা - ৩১।

তাদেরকে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক নিরাপত্তা স্কীমের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।[৩৫২]

বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির পাশাপাশি বিধবা এবং 'স্বামী পরিত্যক্তা' নারীদেরকে নগদে ক্ষুদ্র অর্থ ভাতা প্রদানের জন্য প্রশংসনীয় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমস্যা হলো, বেশিরভাগ নারীই এসব কর্মসূচির ব্যাপারে ওয়াকেবহাল নন। তাছাড়া সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এসব কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহ করা নারীদের পড়্ো বেশ কঠিন কাজ। প্রায় ড়্োত্রে দেখা যায়, যেসব কর্তৃপড়্োর কাছ থেকে তথ্যগুলো পাওয়ার কথা, যেমন স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন অফিস কিংবা পারিবারিক আদালতসমূহ, সেখান থেকে কর্মসূচিগুলোর তথ্য সহজে পাওয়া যায়না। এসব কর্মসূচির অর্থ ভাতা বিতরণে বিলম্ব এবং তহবিল অপব্যবহারের বিষয়টিও অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ভূমি বন্টন কর্মসূচির মতো অন্যান্য সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিগুলোর মধ্যেও রয়ে গেছে বৈষম্যের নানা উপাদান। ফলে সেসব কর্মসূচিও কাঙ্খিত সুফল বয়ে আনতে পারছেনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকারের খাস জমি বিতরণ কর্মসূচিটি 'একমাত্র যে সকল নারী-প্রধান পরিবারে 'সক্ষম পুরুষ' রয়েছে সেসব পরিবারের মধ্যেই' খাস জমি পাওয়ার যোগ্যতাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে।

[৩৫২] পূর্বোক্ত, প্যারা - ৩২।

৭. সুপারিশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের:
সংসদ সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি;

- বিবাহ, বিচ্ছেদ (পৃথক বসবাস), তালাক এবং এতদসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে বাংলাদেশের আইনের ব্যাপক সংস্কারের জন্য কাজ করুন। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং সুশীল সমাজের যেসব সংগঠন নারী অধিকার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিয়ে কাজ করেন তাদের সাথে পরামর্শ করুন। ভুক্তভোগী সকল পক্ষ বা সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে ধর্ম কিংবা নারী-পুরুষ ভেদে বৈষম্য সৃষ্টি করবেনা এমন বিধান সম্বলিত দেওয়ানি আইন প্রণয়নের জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া চালু করুন। অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে পারিবারিক আইন সংশোধনের মাধ্যমে এর বৈষম্যমূলক দিকগুলো দূর করুন এবং সেসব আইন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া জোরদার করুন।

এই প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষসমূহের করণীয় হলো -

- সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে তাদের ধর্মীয় সংশিস্নষ্টতা অস্বীকার না করে বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে বিবাহের উপযোগী করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিন। বাংলাদেশের আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এবং নারী অধিকার বিষয়ে সক্রিয় সংগঠনগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিবাহবিচ্ছেদ আইনের অধীনে বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রগুলোকে প্রসারিত করুন।

- সব ধর্মের অনুসারীদের জন্য বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করুন। বিবাহের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির তথ্য ব্যবস্থা চালু করুন এবং সেখানে বিবাহের যাবতীয় তথ্য এমনভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিন, যাতে বিয়ের প্রমাণ হিসেবে সেসব তথ্য সারা দেশে সহজলভ্য হয়।

- বৈবাহিক সম্পত্তির ধারণার পূর্ণ স্বীকৃতি দিন এবং দাম্পত্য সম্পর্কের পরিসমাপ্তি কালে নারীদের আর্থিক এবং অর্থ-বহির্ভূত অবদানসমূহের স্বীকৃতি দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উক্ত সম্পত্তি সমান ভাগে ভাগ করাকে অনুমোদন করুন। সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য এই বিধান প্রযোজ্য হবে।

- ভরণপোষণ আইনের সংস্কার করুন, এজন্য:

    - ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ণয় করার সময় পারিবারিক আদালতের বিচারকদের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সুর্নিদিষ্ট মানদ- তৈরী করুন। এই মানদ-ের অন্তর্ভুক্ত হবে: সম্পর্কের সময়কাল; দম্পতির নির্ভরশীল পক্ষের শিক্ষালাভ এবং উপার্জন ক্ষমতার উপর

পরিবারের শিশু পরিচর্যা ও সাংসারিক দায়-দায়িত্বের প্রভাব; প্রত্যেক পক্ষের বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত আয়; নির্ভরশীল পক্ষের (স্ত্রীর) নিজেকে নিজে ভরণপোষণের সামর্থ্য; স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য এবং বয়স; নির্ভরশীল পক্ষের চাহিদা এবং জীবনযাত্রার মান; জীবন-জীবিকার অন্যান্য উপায়; এবং অপর পক্ষের পেশাগত উন্নয়নে নির্ভরশীল পক্ষের অবদান।

- স্ত্রীর ভরণপোষনের অধিকারের সাথে তার "বাধ্যতা," "সতীত্ব," "বৈবাহিক কর্তব্য," অথবা "চারিত্রিক সততা" প্রভৃতি মানদন্ড-র মধ্যেকার যাবতীয় সম্পর্ক বিলুপ্ত করুন।

- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের সিদ্ধান্তে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের আইনী দাবীকে অসাংবিধানিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশিস্নষ্ট আইনটি বিলুপ্ত করুন।

- বহুবিবাহের নেতিবাচক ফলাফল এবং তার সাথে পারিবারিক সহিংসতার সম্পর্ক বিষয়ে দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ নিন এবং বহুবিবাহের অবসানের জন্য কাজ করুন। এই সংক্রান্ত তথ্য যাতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমে পাওয়া যায় এবং সেসব তথ্যপ্রাপ্তির ব্যবস্থাটি যাতে প্রতিবন্ধী বান্ধব হয় তা নিশ্চিত করুন।

- বাস্তবে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রথা বাতিলে প্রণীত আইন (যদি থাকে) যাতে বহুবিবাহের শিকার স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের সম্পত্তি, মোহর এবং ভরণপোষণ প্রাপ্তিসহ যাবতীয় অধিকারের সুরক্ষা দেয়, তা নিশ্চিত করুন। বহুবিবাহ প্রথা বাতিল করে কোন আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, পুরুষের একাধিক বিয়ে করার সামর্থ্যকে রোধ করতে পারে এমন আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করুন। এছাড়া স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য বা অবস্থার সুস্পষ্ট তথ্যপ্রমাণসহ আগের স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণের শর্তাবলী এবং বিবাহের নোটিশের সময়কাল বাড়ানোর ব্যবস্থা নিন।

- বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করুন।

- তালাকপ্রাপ্ত, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন (পৃথক বসবাসকারী) এবং স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের জন্য সামাজিক সহায়তা প্রাপ্তির সুর্নিদিষ্ট মানদ-সহ একটি পরিপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করুন।

- দাম্পত্য ভাঙ্গনের শিকার নারীসহ দরিদ্র বা গৃহহীন মানুষকে যেন নির্বিচারে গ্রেফতার ও আটক করা না হয় সেজন্য ভবঘুরে এবং গৃহহীন ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ বাতিল বা সংশোধন

করন্নন। যারা কোন অপরাধমূলক ঘটনার সাথে জড়িত নয় তাদেরসহ নির্বিচারে আটককৃতদের মুক্তি দেওয়ার জন্য অবিলম্বে বিদ্যমান সকল মামলা পর্যালোচনা করন্নন।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতি;

- বিদ্যমান সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি, এতে সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি এবং আবেদনের নিয়ম বিষয়ে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই সম্পর্কিত তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করন্নন এবং তথ্যপ্রাপ্তির ব্যবস্থা যাতে প্রতিবন্ধীবান্ধব হয় তা নিশ্চিত করন্নন।

- সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক আইন সংস্কারের জন্য মন্ত্রিপরিষদ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করন্নন। এর পাশাপাশি বাসস্থান, খাদ্য, কর্মসংস্থান, এবং স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিগুলোতে পৃথক-বসবাসরত এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীদের যাতে পর্যাপ্ত প্রবেশাধিকার থাকে তা নিশ্চিত করন্নন।

- বিতরণকৃত অর্থ লক্ষ্যিত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা এবং তহবিলের অপব্যবহার ও দুর্নীতি চিহ্নিত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে বিধবা এবং "পরিত্যক্ত" নারী বিষয়ক কর্মসূচিসহ নগদ অর্থ ভাতা কর্মসূচিগুলোর উপর নজরদারী বৃদ্ধি করন্নন।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির প্রতি;

- তালাক, বিচ্ছেদ, ভরণপোষন এবং মোহরানার মামলাগুলি স্বাধীন ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার স্বার্থে পারিবারিক আদালতের সক্ষমতা বৃদ্ধি করন্নন। মামলাজট এবং মামলার দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করন্নন; এর জন্য পারিবারিক আদালতে আরও বিচারক নিয়োগের অথবা বিচারকদের উপর থেকে অন্যান্য দেওয়ানি মামলার ভার কমানোর ব্যবস্থা নিন।

- ভরণপোষণের মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের অধীনে বিচারকদের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদানের যে ক্ষমতা রয়েছে সেটিকে অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ প্রদানের জন্য ব্যবহার করতে তাদের প্রতি জরন্নরী নির্দেশনা জারী করন্নন।

- মামলাকারী এবং আদালতের কর্মকর্তাদের কাছে সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি পারিবারিক আদালতে একটি বিশেষ ডেস্ক চালু এবং তাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগের জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করন্নন।

- পারিবারিক আদালত এবং আপীল বিভাগের সকল মামলা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করুন এবং দীর্ঘসূত্রিতা কমানোর জন্য সেগুলোকে যুগোপযোগী করুন। বিশেষ করে, নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক আদালতের সমন জারী পদ্ধতিকে উন্নত করুন :

  - দেওয়ানি আইন পদ্ধতি ও পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ সংস্কারের উদ্যোগ নিন। এসব পদ্ধতির সংস্কার এমনভাবে করুন যাতে (১) সমন এবং পারিবারিক আদালত মামলার নোটিশ আরও অন্য উপায়ে, যেমন ব্যক্তিগত কুরিয়ার সার্ভিস, ফ্যাক্স কিংবা ই-মেইলের মাধ্যমে জারী করা যায়, এবং (২) মামলার একতরফা কাযর্ক্রম শুরু করার আগে সমন জারীর প্রক্রিয়া, লটকাইয়া সমনজারী এবং এভাবে সমন জারীর জন্য যে পরিমাণ সময় ব্যয় হয় সেটিকেও পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ গুরুত্বের সাথে সমন্বিত করা যায়।

  - নেজারত বিভাগ এবং তার সমন কার্যক্রম সংক্রান্ত সেবার উপর তদারকি বৃদ্ধি করুন। নেজারত বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যাপারে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করুন।

  - সমন জারীর কাজে নেজারত কর্মচারীদের যাতায়াত খরচের যোগান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করুন।

- পারিবারিক আদালতের রায়/ডিক্রি যথাসময়ে বলবৎ করার জন্য আইন বাস্তবায়নের একটি শক্তিশালী পদ্ধতি গড়ে তুলুন। ভরণপোষণ বা মোহরানার জন্য আবেদনকারী পক্ষসমূহকে একইসাথে ডিক্রী জারী এবং তা বলবৎ করার আবেদন দাখিলের অনুমতি দিন।

- নারী অধিকার, দেওয়ানি পদ্ধতি, এবং প্রমাণের নিয়ম বিষয়ে পারিবারিক আদালতের বিচারপতিদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা যথাযথ পরিস্থিতিতে *লটকাইয়া সমনজারী* এবং মৌখিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালতে কোন বিবাহ প্রমাণ করা হলে তার অনুমোদন দেয়।

- স্থানীয় লিগ্যাল এইড এনজিও-দের সাথে আলোচনা করে দরিদ্র আবেদনকারীদের জন্য একটি তহবিল গঠন করুন যা থেকে স্বাক্ষীদের হাজিরা বাবদ খরচসহ পারিবারিক আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য কিছু আইনী খরচ যোগানো যায়।

- সকল আইনী প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত সমন্বয় নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করুন যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ঐসব প্রক্রিয়ায় পুরোপুরিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি;

- বিভিন্ন প্রকার গণমাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করুন এবং তা যেন প্রতিবন্ধীবান্ধব হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন। এই প্রচারণায় অংশীদারী বাসস্থানের অধিকার, অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য সুরক্ষা, অস্থায়ী ভরণপোষণ এবং পারিবারিক সহিংসতা বিরোধী আইনের অধীনে নারীদের প্রতিকার চাওয়াকে উৎসাহিত করা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করুন।

- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন, ১৯২৯ -এর বাস্তবায়ন জোরদার এবং সম্প্রসারিত করুন।

- প্রতি জেলায় অন্তত একটি আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সরকারী নারী আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। তালাক বা বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে আর্থিক সমস্যায় জর্জড়িত নারী এবং তরুণীরাসহ পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীরা যাতে এসব আশ্রয়কেন্দ্রে অস্থায়ী বসবাসের জন্য প্রবেশাধিকার পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

- অস্থায়ী জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র থেকে উপার্জনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নিজস্ব বাসস্থানে চলে যেতে নারীদেরকে সাহায্য করার জন্য আয়মূলক এবং অন্যান্য সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির সাহায্য গ্রহণ ছাড়াও প্রয়োজনীয় উপায় বের করতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করুন।

- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে আশ্রিত নারীদের সকল মামলা/ ঘটনা পর্যালোচনা করুন এবং দাম্পত্য ভাঙ্গনের কারণে গৃহহীন হওয়া নারীদের মুক্তি নিশ্চিত করুন।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতি;

- খাসজমি বন্টন কর্মসূচির ক্ষেত্রে নারী প্রধান পরিবারে একজন "সক্ষম" পুরুষ থাকলে সেই পরিবারকে খাস জমি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত করার শর্ত বাতিল করুন।

- অন্যান্য সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনতিবিলম্বে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন বাস্তবায়ন করুন।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি;

- কাজীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত নানা দুর্নীতি, বিবাহের দলিল জাল ও বিকৃতকরণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্তের জন্য একটি প্রক্রিয়া চালু করুন।

- নিজেদের বিবাহ এবং বিবাহ পরবর্তী অধিকার সম্পর্কে নারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার গণমাধ্যমে তথ্য প্রকাশের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করুন এবং সেসব ব্যবস্থা যাতে প্রতিবন্ধীবান্ধব হয় তা নিশ্চিত করুন। কাবিননামা ও এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদের তাৎপর্য এবং কিভাবে নারীরা তাদের বিয়ের সময় সেটির মাধ্যমে সমঝোতা করতে পারে সে বিষয়ে মুসলিম নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করুন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতি;

- স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া চালু করাসহ সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন যথাযথভাবে মনিটর করুন।

- মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের আওতায় সালিস পরিষদের সদস্য হিসেবে তাদের যেসব দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং উক্ত পরিষদগুলোতে তাদের কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল প্রদান করুন।

- সালিসি পরিষদগুলোতে স্থানীয় সরকারের নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রতি;

- নারী প্রধান পরিবার এবং দারিদ্র্য সম্পর্কিত তথ্য ধারাবাহিকভাবে সরকারি প্রতিবেদন, বিশেষ করে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করুন।

- তালাকপ্রাপ্ত, পৃথক বসবাসকারী, এবং বিধবাসহ নারী প্রধান পরিবারগুলোর উপর সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির কার্যকারিতা ও প্রভাব বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক বিশেষণ উপস্থাপন করুন।

আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর প্রতি;

- বাংলাদেশের আইনের অধীনে "অর্থনৈতিক ক্ষতি" সাধন পারিবারিক সহিংসতা হিসেবে গণ্য হতে পারে এই বিষয়টিসহ নিজেদের অর্থনৈতিক এবং আইনগত অধিকার সম্পর্কে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগে সমর্থন বৃদ্ধি করুন।

- পারিবারিক আইনের সংস্কার এবং প্রচলিত আইন ও চর্চায় নারীর প্রতি বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগের প্রতি সহযোগিতা বৃদ্ধি করুন। বিশেষ করে, পৃথক বসবাসকারী, পরিত্যক্ত,

এবং তালাকপ্রাপ্ত নারী অথবা পারিবারিক সহিংসতার শিকার বিবাহিত নারীদের আইনী সহায়তার জন্য সমর্থন বৃদ্ধি করুন।

- সামাজিক সহায়তা লাভে নারীদের সুযোগের অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার সম্পর্কিত একটি আইন তৈরির প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা প্রদান করুন।

- বাংলাদেশে দাতাদের সমর্থন রয়েছে এমন সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিগুলোতে যেন পদ্ধতিগতভাবে নারী প্রধান পরিবারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির তথ্য ও সুযোগের বিষয়টির সাথে পারিবারিক আদালতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির উপর যাতে জোর দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করুন।

- সামাজিক সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার পরিসর এবং কর্মসূচি বৃদ্ধি করুন। বর্ধিত পরিসরে শিশু পরিচর্যাসহ নারীদের গৃহস্থালী কাজকে স্বীকৃতি এবং পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজে নারীদের অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়গুলো গবেষণায় এবং কর্মসূচিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করুন।

- নারী এবং কন্যাশিশুদের জন্য, বিশেষত তালাকপ্রাপ্ত, পৃথক বসবাসকারী, এবং পারিবারিক সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ কিংবা স্বামীর বহুবিবাহের কারণে পালিয়ে আসা নারীদের জন্য সারা বাংলাদেশে জরুরী অস্থায়ী আশ্রায়নের সুযোগ সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করুন।

- বিচার ব্যবস্থা খাতের সংস্কারে দাতাদের সহযোগিতা প্রকল্পগুলোতে যেন পারিবারিক আইনের বৈষম্য বিষয়ে গবেষণা এবং এডভোকেসি, সমন জারী ও ডিক্রী বাস্তবায়নের পদ্ধতিকে যুগোপযোগীকরণ, এবং অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণের অনুমোদনসহ পারিবারিক আদালতের বিচার পদ্ধতি সংশোধনের মতো বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করুন।

- মামলাজট হ্রাস এবং পারিবারিক আদালতের বিচারপতিদের প্রশিক্ষণসহ পারিবারিক আদালতের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করুন।

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি প্রতিবেদনে নারী প্রধান পরিবারের তথ্য, বিশেষ করে তাদের দারিদ্র্যের মাত্রার বিষয়ে তথ্য অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করুন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রতিবেদনটির লেখক ও গবেষক শ্রীমতি অরন্নণা কাশ্যাপ। তিনি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর নারী অধিকার বিভাগের গবেষক (Researcher)। প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে নারী অধিকার বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জ্যানেট ওয়ালস, পরিচালক লিইস্‌ল গার্নথোল্টজ, এবং সিনিয়র এডিটর ড্যানিয়েল হ্যাশ। সিনিয়র লিগ্যাল এডভাইজার এ্যাইসলিং রেইডি, এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর টম পোর্টিয়াসও প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করেছেন। স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার বিভাগের পরিচালক জোসেফ অ্যামন, প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ের গবেষক ও এডভোকেট শান্থা রাউ ব্যারিগ্যা, শিশু অধিকার বিভাগের এশিয়া গবেষক বেডে শেফার্ড, এবং এশিয়া বিভাগের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ের গবেষক তেজ থাপা এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশে তাদের মূল্যবান মতামত এবং তথ্য-উপাত্ত প্রদান করেছেন।

প্রতিবেদনটির প্রাথমিক একটি খসড়ার বিভিন্ন অধ্যায়ে বাইরের যেসব পর্যালোচনাকারী মতামত দিয়েছেন তাদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁরা হলেন নিজেরা করি'র সমন্বয়কারী খুশী কবির, ব্র্যাকের হিউম্যান রাইটস এ- লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস-এর পরিচালক ড. ফস্টিনা পেরেরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষক প্রফেসর শাহ্‌নাজ হুদা, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মেডিয়েশন এ- র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিটের সিনিয়র ডেপুটি ডিরেক্টর নীনা গোস্বামী, এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ- সার্ভিসেস ট্রাস্ট-এর অনারারি ডিরেক্টর সারা হোসেন।

নারী অধিকার বিভাগের ইন্টার্ন শ্রীমতি সংহিতা এ্যামবাস্ট এই গবেষণা কাজে অত্যন্ত গুরন্নত্বপূর্ণ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এই বিভাগের দুই এসোসিয়েটস ম্যাথিউ রালেন্না এবং রাম্বিদজেই সিদুরি প্রতিবেদনটির সম্পাদনা ও বিন্যাসের (Production) ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। প্রকাশনা পরিচালক গ্রেস চোই এবং মেইল ম্যানেজার ফিটজ্‌রয় হেপকিন্স মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংশিন্নষ্ট কাজে সহায়তা দিয়েছেন।

আমাদের গবেষণা কাজে সহায়তা দানের জন্য আমরা অনেক পারিবারিক আইন বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় এনজিও, আইনজীবী, এবং অন্য অনেকের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আশার আলো, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ- সার্ভিসেস ট্রাস্ট (বস্নাস্ট), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল উইমেন লইয়ার্স এসোসিয়েশন, ব্র্যাক হিউম্যান রাইটস এ- লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস, কর্মজীবী নারী, মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন, এবং নিজেরা করি'র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে নিজেদের ডকুমেন্টেশন সেন্টার ও লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে গবেষণায় সহযোগিতা করার জন্য আমরা বস্নাস্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বস্নাস্টের তৎকালীন গবেষণা সহকর্মী এবং যোগাযোগ ও এডভোকেসি সমন্বয়কারী শিরীন লিরা, মাইমুনা আহমেদ এবং

মাহবুবা আক্তারের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁরা মাঠ পর্যায়ে গবেষণার সময় সার্বিক সমন্বয় এবং অনুবাদ সহায়তা দিয়েছেন।

সর্বোপরি যেসব নারী তাঁদের বিয়ে, পৃথক বসবাস এবং বিবাহ বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতাগুলোর স্মৃতিচারণ করে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যেসব সরকারি কর্মকর্তা, বিচারক, *কাজী* এবং তথ্যদাতারা এই প্রতিবেদনটি তৈরির জন্য তাদের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হয়েছেন তাদের সহায়তাকেও আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। এর যে কোন ভুল ভ্রান্তি কিংবা কোন কিছু বাদ পড়ে থাকলে তার সম্পূর্ন দায় হিউম্যান রাইটস ওয়াচ স্বীকার করছে।

এই প্রতিবেদনটিকে ইংরেজী থেকে বাংলায় ভাষান্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য আমরা উন্নয়ন পরামর্শক ও গবেষক স্বাগতম চাকমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অর্কেডিয়া, ফোর্ড ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য দাতা সংস্থা যারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর নারী অধিকার বিভাগের কর্মকর্তাকে সহায়তা ও সমর্থন দিয়েছেন, তাদের আর্থিক অনুদানের কথাও আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

পরিশিষ্ট - ১

বিবাহের চুক্তি

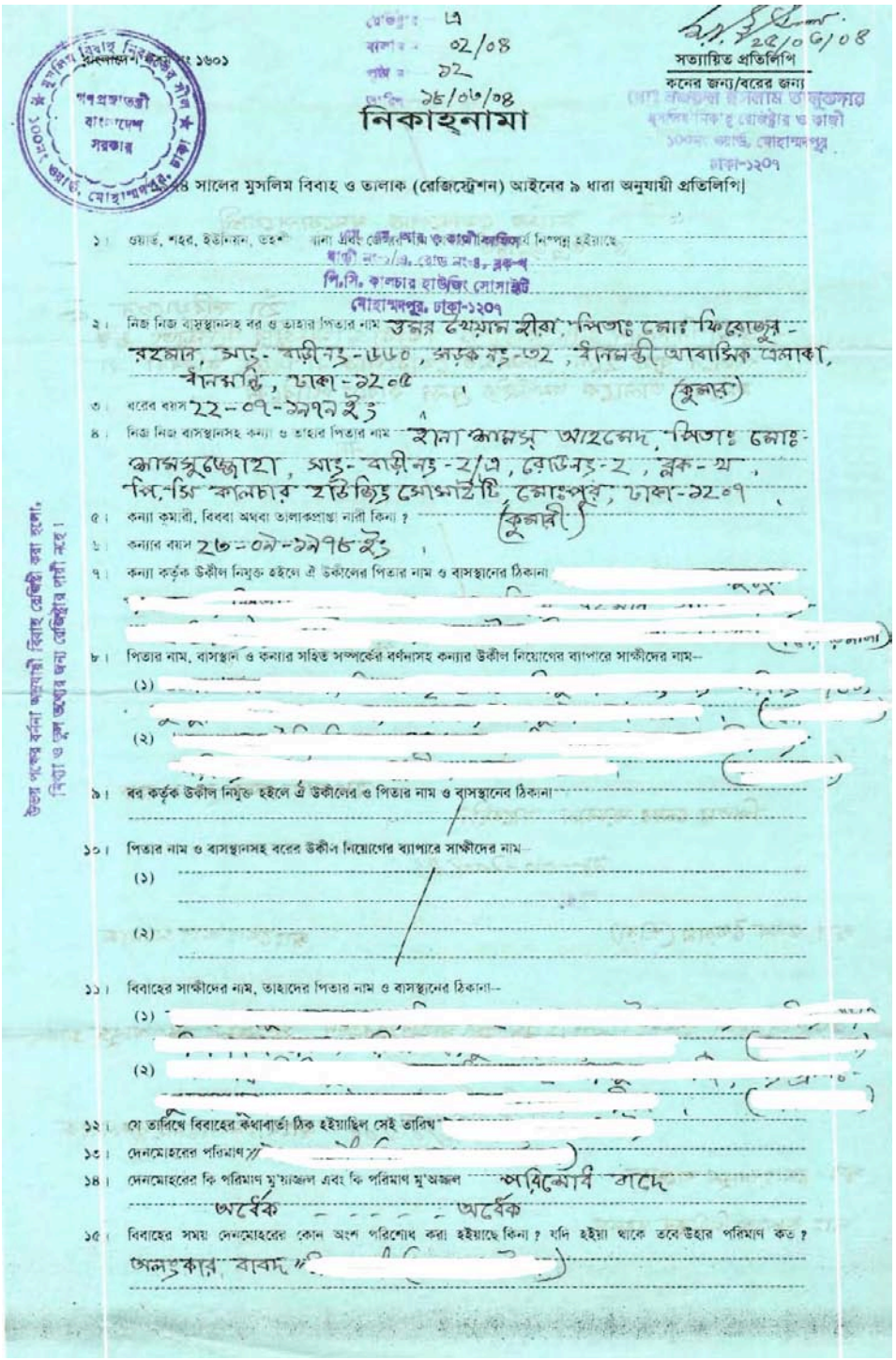

রেজিস্টার: ৫
বালাম: ০২/০৪
পৃষ্ঠা: ১২
তারিখ: ১৮/০৬/০৪

সত্যায়িত প্রতিলিপি
কনের জন্য/বরের জন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিকাহনামা

[illegible] সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী প্রতিলিপি।

১। ওয়ার্ড, শহর, ইউনিয়ন, ভহশ থানা এবং জেলার নাম ও কাজী নিকাহ নিষ্পন্ন হইয়াছে
বাড়ী নং ৩/এ, রোড নং ৪, ব্লক খ
পি.সি. কালচার হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

২। নিজ নিজ বাসস্থানসহ বর ও তাহার পিতার নাম উজ্জ্বল মিয়া, পিতাঃ মোঃ ফিরোজুর রহমান, সাঃ- বাড়ী নং-৫৫০, সড়ক নং-৩২, বনানী আবাসিক এলাকা, বনানী, ঢাকা-১২০৫ (কুমার)

৩। বরের বয়স ২২-০৭-১৯৭৯ ইং

৪। নিজ নিজ বাসস্থানসহ কন্যা ও তাহার পিতার নাম হানা আহমেদ, পিতাঃ মোঃ আমজুজ্জোহা, সাঃ- বাড়ী নং-২/এ, রোড নং-২, ব্লক-খ, পি.সি. কালচার হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

৫। কন্যা কুমারী, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা নারী কিনা? (কুমারী)

৬। কন্যার বয়স ২৬-০৯-১৯৭৬ ইং

৭। কন্যা কর্তৃক উকীল নিযুক্ত হইলে ঐ উকীলের পিতার নাম ও বাসস্থানের ঠিকানা

৮। পিতার নাম, বাসস্থান ও কন্যার সহিত সম্পর্কের বর্ণনাসহ কন্যার উকীল নিয়োগের ব্যাপারে সাক্ষীদের নাম--
(১)
(২)

৯। বর কর্তৃক উকীল নিযুক্ত হইলে ঐ উকীলের ও পিতার নাম ও বাসস্থানের ঠিকানা

১০। পিতার নাম ও বাসস্থানসহ বরের উকীল নিয়োগের ব্যাপারে সাক্ষীদের নাম--
(১)
(২)

১১। বিবাহের সাক্ষীদের নাম, তাহাদের পিতার নাম ও বাসস্থানের ঠিকানা--
(১)
(২)

১২। যে তারিখে বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হইয়াছিল সেই তারিখ

১৩। দেনমোহরের পরিমাণ

১৪। দেনমোহরের কি পরিমাণ মু'য়াজ্জল এবং কি পরিমাণ মু'অজ্জল পরিশোধ বাদে
অর্ধেক অর্ধেক

১৫। বিবাহের সময় দেনমোহরের কোন অংশ পরিশোধ করা হইয়াছে কিনা? যদি হইয়া থাকে তবে উহার পরিমাণ কত?
অলঙ্কার বাবদ

উক্ত পক্ষের বর্ণনা অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রী করা হলো।
পিতা ও কন্যা অথবার জন্য রেজিস্ট্রার দায়ী নহে।

১৬। বিশেষ বিবরণ ও পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিসূত্রে নির্ণীত মূল্যসহ কোন সম্পত্তি সম্পূর্ণ দেনমোহর বা উহার অংশ বিশেষের পরিবর্তে প্রদত্ত হইয়াছে কিনা ? /

১৭। বিশেষ শর্তাদি থাকিলে তাহা মাসিক খোরপোষ অসম্ভোষজনক ও ভদ্রজনচিত

১৮। স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে কিনা ? করিয়া থাকিলে কি কি শর্তে হ্যাঁ করিয়াছেন, স্বামী নিরুদ্দেশ দীর্ঘ কারাবাস কিংবা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সুষ্ঠু পালনে ব্যর্থ হলে, নিয়মিত খোরপোষ না দিলে, বনিবনা না হইলে তালাকে অফটইজ গ্রহন করিতে পারিবেন ।

১৯। স্বামীর তালাক প্রদানের অধিকার কোন প্রকারে খর্ব হইয়াছে কিনা ? না

২০। বিবাহের সময় দেনমোহর, খোরপোষ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন দলিল করা হইয়াছে কিনা ? যদি হইয়া থাকে তবে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ /

২১। বরের কোন স্ত্রী বর্তমান আছে কিনা এবং থাকিলে অন্য বিবাহে আবদ্ধ হইবার জন্য বর ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স মোতাবেক সালিসী কাউন্সিলের অনুমতি লইয়াছে কিনা ? স্ত্রী নাই

২২। অন্য বিবাহে আবদ্ধ হইবার জন্য সালিসী কাউন্সিলের নিকট হইতে বরের নিকট প্রেরিত অনুমতি পত্রের নম্বর ও তারিখ /

২৩। যে ব্যক্তির দ্বারা বিবাহ পড়ানো হইয়াছে তাহার নাম ও তাহার পিতার নাম

২৪। বিবাহ রেজিস্ট্রি করার তারিখ

২৫। পরিশোধিত রেজিস্ট্রি ফি পরিশোধ

স্বাঃ

বর বা তাহার উকিলের স্বাক্ষর।

বরের উকিল নিয়োগের ব্যাপারে সাক্ষীর স্বাক্ষর।

স্বাঃ

কন্যার স্বাক্ষর

কন্যার উকিলের স্বাক্ষর

কন্যার উকিল নিয়োগের ব্যাপারে সাক্ষীর স্বাক্ষর।

বিবাহের সাক্ষীদের স্বাক্ষর ঃ

(১)

(২)

নিকাহ রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর

সাল

যে ব্যক্তির দ্বারা বিবাহ পড়ান তাহার স্বাক্ষর।

বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিসের মুদ্রণাদেশ নং-[illegible] তাং [illegible] ইং।
গভঃমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- [illegible]

পরিশিষ্ট - ২

নীচের টেবিলে বাংলেদেশের ৬১টি জেলায় ব্র্যাক হিউম্যান রাইটস এ- লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস -এর তত্ত্বাবধানে পারিবারিক আদালতে বিচারাধীন ভরণপোষণ সংক্রান্ত্ম মামলার তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। মামলাগুলি বিচার-পূর্ব, বিচারাধীন এবং বাস্ত্মবায়নপর্ব - এই তিন স্ত্মরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কত বছর ধরে ভরণপোষণ সংক্রান্ত্ম মামলাগুলি বিচারাধীন রয়েছে (১৯৯৮ সাল থেকে ৩১ মে ২০১২ পর্যন্ত্ম)	*বিচার-পূর্ব স্ত্মরে ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা*	*বিচারাধীন মামলার সংখ্যা*	*ভরণপোষণের আদেশ হওয়ার পরও বাস্ত্মবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে এমন মামলার সংখ্যা*	*ঝুলে থাকা মোট মামলার সংখ্যা*
২ বৎসরের নীচে	৩,০৩১	১,১০৯	১,৬৫৭	৫,৭৯৭
২ বৎসর কিংবা তারও বেশী কিন্তু ৫ বৎসরের নীচে	৮৯৭	৬৪৮	১,২৬৪	২,৮০৯
৫ বৎসর কিংবা তারও বেশী কিন্তু ১০ বৎসরের নীচে	১৭৬	১১৩	২৯৬	৫৮৫
১০ বৎসর কিংবা তারও বেশী	৩	১	১০	১৪
মোট	***৪,১০৭***	***১,৮৭১***	***৩,২২৭***	***৯,২০৫***

বিবাহ, তালাক ও বিচ্ছেদ বিষয়ে বাংলাদেশের শত শত বছরের পুরনো পারিবারিক আইনগুলি যুগের পর যুগ ধরে নারীর প্রতি কেবল বিদ্বেষ ও বৈষম্যই সৃষ্টি করেছে এবং প্রয়োজনের সময় সুবিধামতো নীরব বা নিষ্ক্রিয় থেকেছে। মুসলিম, হিন্দু এবং খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রযোজ্য এসব ভিন্ন ভিন্ন আইন বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর জন্য বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। ভরণপোষণ দাবীর ক্ষেত্রেও এসব আইনের দিকনির্দেশনাগুলি বেশ অস্পষ্ট। পরিবারে নারীর অবদানের বিষয়টি এসব আইনে উপেক্ষিত তো বটেই, তার উপর দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার সময় বৈবাহিক সম্পত্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার কোন বিধানও পারিবারিক আইনের মধ্যে রাখা হয়নি।

নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পারিবারিক আইনগুলির সীমাবদ্ধতা প্রত্যক্ষ করেছেন এমন ১২০ জন নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণসহ পারিবারিক আদালতের বিচারক, আইনজীবী, নারী অধিকার বিশেষজ্ঞ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন "আমার পাওনা .... মৃত্যুর আগে কি পাবো?" শিরোনামের এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলাদেশের নারীসমাজ, তাদের উপর নির্ভরশীল পোষ্য এবং নারীর মৌলিক অধিকার ভোগের সক্ষমতার উপর বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইনগুলি কি ধরনের নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্টজনদের অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। পারিবারিক আদালতের রায়ে নারী যদি সীমিত ভরণপোষণ কদাচিৎ পেয়েও থাকেন, সে রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যার কথাও এই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার ফলে বহু নারী যেভাবে দারিদ্র্যের শিকার হন তাতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে অসংগতিপূর্ণ এবং বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইনগুলির অবদান কম নয়। জাতিসংঘের বাংলাদেশ কান্ট্রি টীম 'বৈবাহিক অস্থিতিশীলতা'কে নারী প্রধান পরিবারে দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ হলো, তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামী-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নারীরা অনেক বেশি দারিদ্র্য কবলিত হয়ে পড়েন। বিদ্যমান পারিবারিক আইনগুলি নারীর অন্যসব অধিকার হারানোর মাত্রাকেও বাড়িয়ে দেয়। যেমন - পারিবারিক নির্যাতন, নারীর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, নিরাপদ বাসস্থানের অভাব, স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিকার হরণের প্রবণতা এসব আইন দ্বারা আরও উৎসাহিত হয়।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও আইনী সংস্কারের কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আইনী সংস্কারের পক্ষে বাংলাদেশের নারী অধিকার কর্মী ও সংগঠনগুলির জোরালো দাবী তুলে ধরার পাশাপাশি এই প্রতিবেদনটি আইনী সংস্কারকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। বাংলাদেশে তালাকপ্রাপ্ত ও স্বামী-বিচ্ছিন্ন অসংখ্য নারীর গুরুতর নানা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পারিবারিক আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার সংস্কারসহ চলমান সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিগুলিকে অধিকতর উন্নত এবং দরিদ্র নারী-বান্ধব করার জন্যও এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের একটি নেতৃস্থানীয় নারী অধিকার সংগঠন - বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত এক শোভাযাত্রায় অংশ নিচ্ছেন, শনিবার, ৮ মার্চ ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ। ব্যানারে লেখা আছে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস, নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চাই সম্পদ ও সম্পত্তিতে সমানাধিকার।"

© ২০০৮ এপি ফটো